প্রশিক্ষণ স্তর
Training Stage

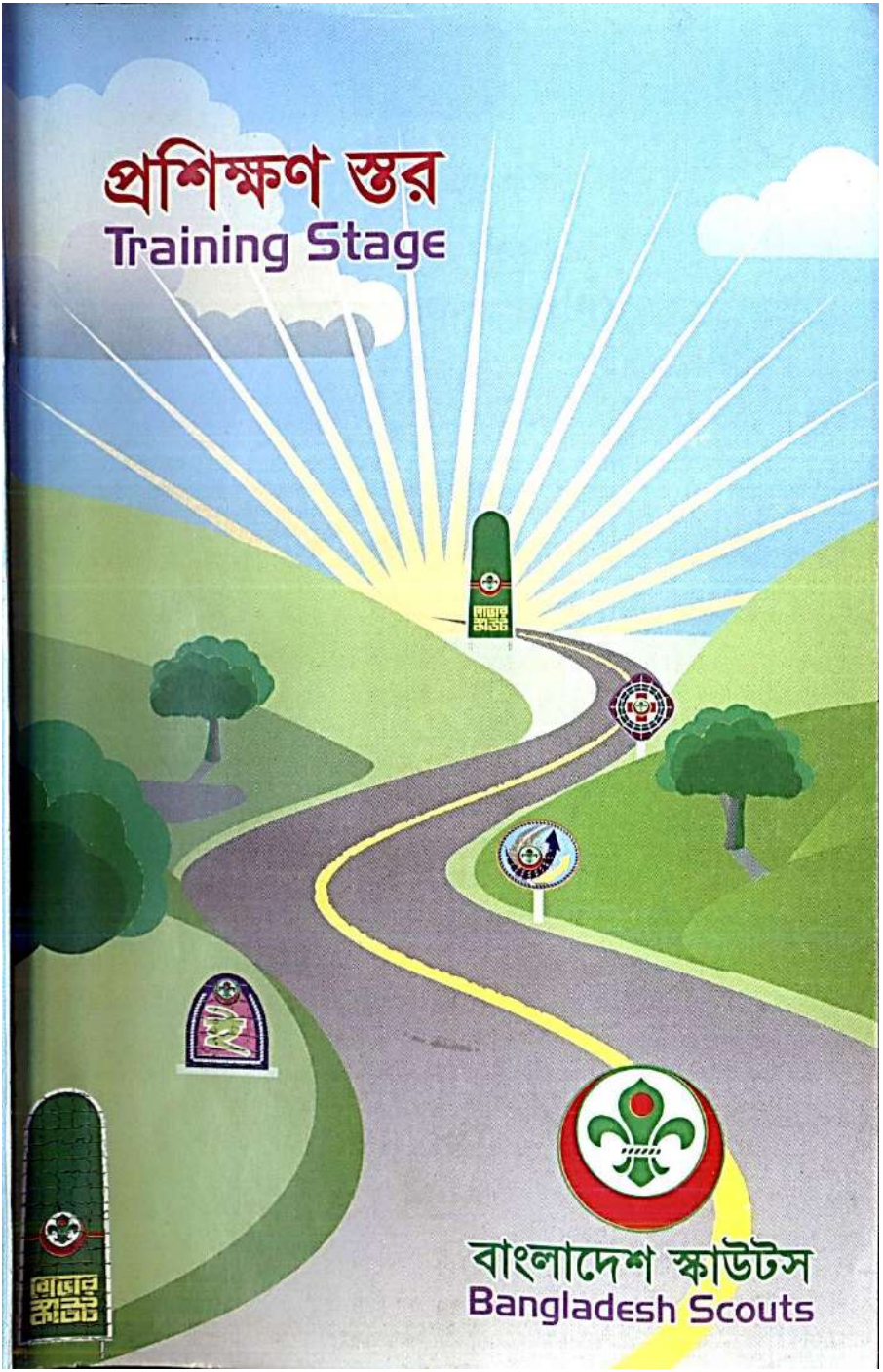

বাংলাদেশ স্কাউটস
Bangladesh Scouts

প্রশিক্ষণ স্তর

TRAINING STAGE

(রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম)

বাংলাদেশ স্কাউটস

BANGLADESH SCOUTS

প্রশিক্ষণ স্তর
(রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম)

স্বত্ব : বাংলাদেশ স্কাউটস

সংকলনে : প্রশিক্ষণ স্তর ও সেবা স্তর টাস্কফোর্স

সম্পাদনা : প্রোগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রকাশনায় : ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক
দিগন্ত মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৪

দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৭

মূল্য : ২৩ (তেইশ) টাকা

মুদ্রণে : মাহির প্রিন্টার্স
২২৪/১ ফকিরেরপুল, ১ম গলি, ঢাকা-১০০০

মুখবন্ধ

স্কাউট আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম। শিশু কিশোর ও যুবকদের অবসর সময়ের সঠিক ব্যবহার করে তাদের সুশৃঙ্খল, পরোপকারী, আত্মনির্ভরশীল, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে তৈরিতে স্কাউটিং কার্যক্রম যুগ যুগ ধরে খুবই সহায়ক বলে বিবেচিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ স্তর বইয়ের বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুশীলন করে রোভার স্কাউটরা নিজেদেরকে রোভার স্কাউট এর সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে তৃতীয় ধাপ অতিক্রমের উপযোগী রূপে তৈরি করে। কাজেই রোভার স্কাউটদের জন্য এই বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই স্কাউটিংয়ের শিক্ষার জন্য এই বইয়ের অনুশীলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে স্কাউট কার্যক্রম কোন সময়ই বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। স্কাউটিং মূলতঃ মুক্ত অঙ্গনের শিক্ষা। প্রকৃতির উদার পরিবেশে আনন্দময় খেলাধুলা ও শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা জীবন গঠনে সুন্দরভাবে কাজে লাগে। বর্তমান বইটি বিষয়বস্তু অনুশীলনের পথ ধরে ছেলে মেয়েরা রোভারিংয়ের আনন্দময় জগতে প্রবেশ করবে। সেই সঙ্গে তারা সকলের উপকারে নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলবে। এভাবে একজন রোভার স্কাউট সেবার মূলমন্ত্র অনুসরণে জীবন গঠনে তৎপর হয়ে জাতির যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে।

রোভার স্কাউট ইউনিটে এ বইয়ের বিষয়গুলো অনুশীলন ও ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়নের জন্য রোভার স্কাউট এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডার ও অভিভাবকবৃন্দকে অনুরোধ জানাচ্ছি। স্কাউটিং কার্যক্রমে ও ক্যাম্পিং এ স্কাউটদের নিরাপত্তার বিষয়ে ইউনিট লিডার ও অভিভাবকবৃন্দকে অধিক যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। তাঁরা এ বিষয়ে যৌথভাবে ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করি। এছাড়া চলমান প্রক্রিয়ায় আগামীতে রোভার প্রোগ্রামকে আরো বেশী যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে ইউনিট লিডারসহ সকল স্তরের বয়স্ক নেতাদের নতুন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। প্রশিক্ষণ স্তর বইটির পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস প্রোগ্রাম বিভাগ পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্সের আহবায়ক, সদস্য ও সদস্য সচিব সকলেই রোভার স্কাউট হওয়ায় তাদের (রোভার স্কাউটদের) মননশীল চিন্তা ভাবনা ও চাহিদা অনুযায়ী বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রণীত হয়েছে। তাদের এই কাজটি নির্ভুল এবং সার্বজনীন করার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ রোভার স্কাউট লিডার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই মুহূর্তে আমি তাদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আশা করি **প্রশিক্ষণ স্তর** বইটি দেশে রোভারিং কার্যক্রমকে আরো বেশী গতিশীল করবে এবং যোগ্য নাগরিক তৈরিতে একজন রোভার স্কাউটকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস

পটভূমি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (১৮৫৭-১৯৪১) স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই স্কাউট বয়সী ছেলেমেয়েদের চাহিদা বিবেচনা করে কিছু বই প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্বে প্রকাশিত বইসমূহের সহায়তায় বয়সভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন শাখার অর্থাৎ কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার জন্য পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এই বই সমূহে স্কাউটিং কার্যক্রমে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রচারণামূলক দিক নির্দেশনাসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণীয় এবং করণীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে স্কাউটিংয়ের দ্রুত প্রসার এবং দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য এখনও লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের লেখা আকর্ষণীয় বইগুলোর কোনো বিকল্প নেই।

স্কাউট আন্দোলন শুরুর আগে ও পরে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য যে সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো নিম্নরূপ ঃ-

এইডস টু স্কাউটিং	-১৮৯৯	এ বই পড়েই অনেকে স্কাউটিংয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে
স্কাউটিং ফর বয়েজ	-১৯০৮	স্কাউট শাখার জন্য
উলফ কাব হ্যান্ডবুক	-১৯১৬	কাব স্কাউট শাখার জন্য
এইডস টু স্কাউট মাস্টারশীপ	-১৯২০	অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য
রোভারিং টু সাকসেস	-১৯২২	রোভার স্কাউট শাখার জন্য

দীর্ঘদিন ধরে স্কাউটদের জন্য এ বইগুলো প্রচলিত থাকলেও বিবর্তন এবং যুগ ও দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্কাউটিংয়ে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আর সেসব নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ বইপত্রও রচিত হয়েছে এবং এখনও তার অনুসরণ চলছে।

বৃটিশ শাসনামলে ১৯২০ সালে অবিভক্ত ভারতের এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। তখন স্কাউটিং কার্যক্রমে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত স্তর ভিত্তিক বইগুলি ব্যবহার করা হতো। এই স্তর ভিত্তিক বইগুলো হচ্ছে-টেন্ডার ফুট, সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। এই স্তর ভিত্তিক বইসমূহে বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজের করণীয় উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে প্রতিটি ব্যাজের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পৃথক পৃথক বই রচনা করা হয়।

বৃটিশ শাসনামলের অবসানের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সুচনা থেকে এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন নতুনভাবে সংগঠিত হয়। সেই সময়ের প্রথম পর্যায়ে বৃটিশ আমলে ইংরেজিতে প্রকাশিত স্তর ভিত্তিক বইগুলি ব্যবহৃত হলেও তৎকালীন পূর্ব

পাকিস্তানে স্কাউটিংয়ের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা বইগুলি বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় টেন্ডার ফুট বইটিকে 'কচি কদম', সেকেন্ড ক্লাস বইটিকে 'দ্বিতীয় কদম' এবং ফাস্ট ক্লাস বইটিকে 'দৃপ্ত কদম' নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। এই অনুবাদের ধারাবাহিকতায় স্কাউটার মরহুম এম ওয়াজেদ আলী ব্যাডেন পাওয়েল এর লেখা 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি 'বালকদের স্কাউট শিক্ষা' নামে ১৯৫৭ সালে বাংলায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে বই অনুবাদ কার্যক্রম একটি চলমান কর্মসূচিতে রূপ লাভ করে। অনুবাদের চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে তরিকুল আলম ও জহুরুল আলম ১৯৫৯ সালে 'কাব স্কাউট হ্যান্ডবুক' বইটিকে 'কাব স্কাউট শিক্ষা' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গৃহিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলিকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম সংগঠিত হতে থাকে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলন পূর্নগঠিত হলে স্কাউটিংয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্কাউটিং সম্পর্কিত পাঠ্য বইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুনভাবে শুরু করা রোভারিং কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৭৩ সালে স্কাউটার আ স মু মাকসুদুর রহমান 'রোভার পরিকল্পনা' নামে বইটির পান্ডুলিপি রচনা করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের নীতি, পদ্ধতি ও পরিচালনার জন্য পি.ও.আর (নীতি, সংগঠন ও নিয়ম) নামের বইটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে কয়েক বছর ব্যবহৃত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" নামে প্রথমবারের মতো গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে "গঠন ও নিয়ম" নামে নতুনভাবে নীতি পদ্ধতির বইটি প্রকাশ করা হয়। স্বাধীন দেশে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত স্তরভিত্তিক বইসমূহের তথ্য এবং বাস্তব চাহিদা নিরূপণ করে ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম নূরুলিসলাম শামসের উদ্যোগে নতুন স্কাউট প্রোগ্রাম নির্ধারণ করে ঐ প্রোগ্রামের আলোকে বয় স্কাউট শাখার বই লেখা হয়। প্রোগ্রাম অনুসারে বইগুলির পান্ডুলিপি প্রণয়ন করেন তৎকালীন রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তৎসময়ে রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম ও তৎকালীন রোভার স্কাউট মোজাহারুল হক মঞ্জু। এসব পান্ডুলিপির ভিত্তিতে নিম্নের শাখাভিত্তিক বইসমূহ প্রকাশিত হয়।

সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড	১৯৭৯
প্রোগ্রেস	১৯৮০
সার্ভিস	১৯৮১

এই স্তর ভিত্তিক বইসমূহে স্কাউটদের জন্য পালনীয় পারদর্শিতা ব্যাজের প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে স্কাউটরা স্ব স্ব স্তরের প্রোগ্রাম অনুসরণ করে ব্যাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে বয় স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহকে একত্রিত করে 'বয় স্কাউট' নামে এটি অখন্ড বই প্রকাশ করা হয়। এই অখন্ড বইটির মধ্য দিয়ে স্কাউটদের নিকট ক্রমোন্নতিশীল স্কাউট প্রোগ্রাম অনুসরণ অধিকতর সহজ করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে স্কাউট শাখার প্রোগ্রামে আবার পরিবর্তন আনা হয় এবং পারদর্শিতা ব্যাজের কর্মসূচিকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই পর্যায়ে স্কাউট প্রোগ্রামকে আরও বেশি কার্যকরী করার জন্য স্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে বই প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক সময়ের অত্যন্ত দক্ষ স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বই সমূহ প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

সদস্য ব্যাজ	আরিফ বিল্লাহ আল মামুন	১৯৯৭
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান	১৯৯৫
প্রোগ্রেস	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	১৯৯৬
সার্ভিস ব্যাজ	মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া	১৯৯৬

স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের পাশাপাশি ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিক থেকে কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার স্তর ভিত্তিক বইসমূহের পান্ডুলিপি প্রণেতা ও প্রকাশ সময় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সদস্য ব্যাজ	মোঃ আব্দুল ওয়াহাব	১৯৯৫
তারা ব্যাজ	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৯৯৬
চাঁদ ব্যাজ	রওশন আরা বিউটি	১৯৯৭
চাঁদ তারা ব্যাজ	মোছাম্মৎ জোহরা আক্তার	১৯৯৭
রোভার সহচর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯৭
সদস্য স্তর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯২
প্রশিক্ষণ স্তর	মোঃ আরিফুজ্জামান	১৯৯৫
সেবা স্তর	আদিল হায়দার সেলিম	১৯৯৬

এছাড়া রোভার স্কাউটদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত 'রোভারিং টু সাকসেস' বইটি প্রবীণ লিডার ট্রেনার এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর মাহাবুবুল আলম

বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট আন্দোলনের পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক চলমান প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চাহিদা অনুভূত হওয়ায় স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখায় ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে আরও বেশি আধুনিকীকরণ করার জন্য ২০০০ সালে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীকের নেতৃত্বে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য জুবায়ের ইউসুফের তত্ত্বাবধানে 'স্কাউট প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স' এবং মোঃ আরিফুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে 'রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স' নামে দুটি পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টির মাধ্যমে উভয় শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী করার জন্য যাত্রা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে তৎসময়ের জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া ও কাজী নাজমুল হক নাজু প্রোগ্রাম নবায়নে টাস্কফোর্স দু'টিকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন। এই প্রক্রিয়ায় রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট মোহাম্মদ জামাল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই টাস্কফোর্স দু'টি প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য ২০০১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আলোচনা পর্যালোচনাসহ জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রাম নবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রচলিত প্রোগ্রামে সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার স্কাউট প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে পূর্ণতা দেয়া হয়। এই কাঠামোগত পূর্ণতা তৈরির পর উভয় শাখায় অন্তর্ভূক্ত নতুন নতুন বিষয়বস্তু ও ব্যাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গৃহিত হয়। এই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কাব স্কাউট ও স্কাউট শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত বই সমূহকে আরও বেশি আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরিমার্জিত আকারে প্রস্তুতকৃত বইসমূহ প্রকাশনায় তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মুহঃ ফজলুর রহমান সার্বিক সহায়তা দান করেন এবং বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বইগুলি সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।

২০০৪ সালে প্রচলিত বইসমূহ পরিমার্জিত আকারে প্রকাশের কিছুদিন পরেই ২০০৩ সালে প্রণয়নকৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রামের কাঠামো দু'টিকে পুনরায় যাচাই

বাছাই করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই যাচাই বাছাইয়ের জন্য ২০০৪-২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ ফোরাম এবং জাতীয় ওয়ার্কশপসহ আয়োজিত আলোচনাসমূহ বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন তৎসময়ের প্রোগ্রাম বিভাগে দায়িত্ব পালনকারী জাতীয় উপ কমিশনার সরোয়ার মোঃ শাহরিয়ার, মোঃ মাহমুদুল হক এবং মোঃ মনিরুল ইসলাম খান। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ সমন্বিত করে ২০০৯ সালে স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগকে কার্যকরী করার লক্ষ্য নিয়ে স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখায় প্রোগ্রাম বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে জুবায়ের ইউসুফ ও মোঃ আরিফুজ্জামানকে পৃথকভাবে পুনরায় আহবায়কের দায়িত্ব দিয়ে প্রোগ্রাম বই প্রকাশের জন্য দু'টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক ও স্কাউটার খন্দকার সাদিদ সাঈদ। টাস্কফোর্সের একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক ও জাতীয় সদর দফতর এবং জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়। প্রায় ২৫ বছরের ব্যবহৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের জন্য ২০০৩ সাল থেকে শুরু ২০০৯ সাল পর্যন্ত গৃহিত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯ সালের প্রথম দিকে জাতীয় প্রোগ্রাম কমিটির তৎকালীন সভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই গৃহিত পদক্ষেপের ফলে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া এর উপস্থাপনায় ০৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় কাউন্সিলের ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশনে উভয় শাখার প্রোগ্রাম অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এই বইগুলোর পান্ডুলিপি তৈরির জন্য আলাদা আলাদা টাস্কফোর্সকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ স্তর বইটি প্রকাশনার জন্য পান্ডুলিপি সংকলন করে প্রশিক্ষণ স্তর ও সেবা স্তর বিষয়ক টাস্কফোর্স। মূলত: টাস্কফোর্সের কো-অর্ডিনেটর স্কাউটার শেখ জাবেদ মোজাক্কের-উর-রহমান (শোভা), প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট এবং স্কাউটার ফরহাদ হোসেন, প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট। আধুনিকীকরণকৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম জাতীয় কাউন্সিলে অনুমোদনসহ প্রণয়নকৃত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত এই বই প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধিকে আরও বেশী জোরদার করেছেন।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১.	বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রশাসনিক বিন্যাস, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী	১০
০২.	বাংলাদেশের প্রচলিত আইন জানা	১৫
০৩.	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন	১৭
০৪.	জাতিসংঘ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন	২৩
০৫.	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন	২৯
০৬.	রেকর্ড সংরক্ষণ	৩৭
০৭.	ব্যবহারিক দক্ষতা	৩৮
০৮.	কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন	৩৯
০৯.	রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান	৪২
১০.	দক্ষতা অর্জন	৪৩
১১.	ধর্মীয় কার্যাবলী ও মূল্যবোধ	৪৮
১২.	স্কাউটিং সেবা কার্যক্রম	৬২
১৩.	সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন	৬৩
১৪.	স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৭৬

০১. বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রশাসনিক বিন্যাস, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

বিশ্ব স্কাউট সংস্থা- বিশ্বের ১৬১ টি দেশে (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত) স্কাউট আন্দোলন- যুব নেতৃত্ব তৈরি, প্রতিভার বিকাশ সাধন, সৃজনশীল কর্মকান্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ, দূর্যোগ মুহূর্তে মানবতার প্রয়োজনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সর্বোপরি সৎ, যোগ্য ও ভালো মানুষ তৈরি কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ০১ আগস্ট, ২০০৭ শতবর্ষ উদযাপন করে স্কাউট আন্দোলন 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড'-এ স্থান করে নেয় আপন মহিমায়। নিম্নে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রশাসনিক বিন্যাস, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ক) প্রশাসনিক বিন্যাস-

ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্স: World Organization of the Scout Movement (WOSM) হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ। এই সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিটি জাতীয় স্কাউট সংগঠনের ০৬ জন সদস্য নিয়ে World Scout Conference পরিচালিত হয়। যে সকল দেশে একাধিক জাতীয় স্কাউট সংগঠন আছে তাদের সকলকে একত্রিত হয়ে একটি কনফেডারেশন গঠন করতে হয়। এই কনফেডারেশন World Scout Conference-এ তাদের প্রতিনিধি মনোনয়ন দান করেন। যদি কোন জাতীয় স্কাউট সংগঠন হতে একজন অংশগ্রহণ করেন তবে তিনি একা ০৬টি (ছয়) ভোট প্রদান করতে পারেন। কনফারেন্সে অনুপস্থিত জাতীয় স্কাউট সংগঠনের পক্ষে অন্য কেউ ভোট প্রদান করতে পারেন না। এই কনফারেন্স প্রতি ০৩(তিন) বছর পর পর সভায় মিলিত হয়। প্রতি ত্রৈ-বার্ষিক সভায় নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়-

১. World Scout Committee (WSC) কর্তৃক সুপারিশকৃত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২. World Scout Committee (WSC) কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটি ও টাস্কফোর্সের রিপোর্ট পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

৩. World Scout Committee (WSC) সদস্যদের শূণ্য পদে প্রার্থী নির্বাচন।

বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রশাসনিক বিন্যাস

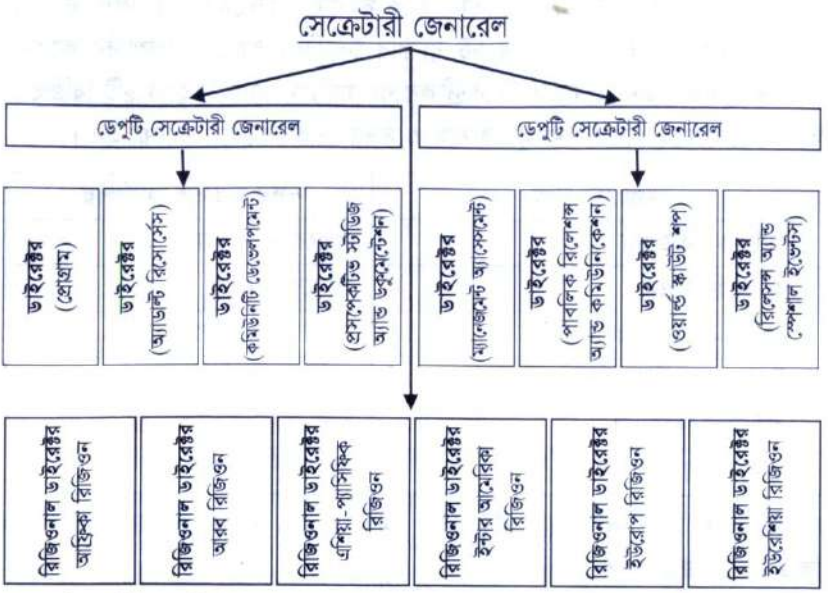

ওয়ার্ল্ড স্কাউট কমিটি: World Scout Committee বিশ্ব স্কাউট আন্দোলন WOSM-এর নির্বাহী পরিষদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। World Scout Committee গঠন হয় ১২টি স্কাউট সংগঠনের ১২ জন সদস্য নিয়ে। কার্যকাল ০৬ (ছয়) বছর। তিন বছর পর পর স্বীয় কার্যকালের মেয়াদ শেষে ০৬ (ছয়) জন অবসর গ্রহণ করেন এবং শূণ্য পদে ০৬ (ছয়) জন নতুন সদস্য যোগদান করেন। একবার নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়াদ শেষে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য নূন্যতম ০৩ (তিন) বছর অপেক্ষা করতে হয়। এই কমিটির সদস্যগণ কোন দেশের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন না বরং ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচিত হন। ০৬(ছয়) টি রিজিওনাল স্কাউটের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে World Scout Committee -এর সদস্য। তবে তাঁরা নন-ভোটিং সদস্য।

ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো: World Scout Bureau বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সচিবালয়। এর কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। World Scout Conference ও World Scout Committee -এর গৃহিত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ

বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরোর। ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরোর প্রধান নির্বাহী- সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি তাঁর সহকর্মী বিভাগের পরিচালক ও উপ-পরিচালকদের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরোর দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদন করেন। কাজের সুবিধার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে ৬টি রিজিওনে ভাগ করা হয়েছে। রিজিওনসমূহের নাম ও সদর দফতর নিম্নে দেওয়া হল।

অঞ্চলের নাম	সদর দফতর/কার্যালয়
আফ্রিকা রিজিওন	নাইরোবি, কেনিয়া
আরব রিজিওন	কায়রো, মিশর
এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওন	ম্যানিলা, ফিলিপাইন
ইন্টার আমেরিকা রিজিওন	সান্টিয়াগো, চিলি
ইউরোপ রিজিওন	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
ইউরেশিয়া রিজিওন	ইয়াল্টা, ইউক্রেন

*'বাংলাদেশ স্কাউটস' সহ ২৪টি দেশ (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত) এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনের আওতাভূক্ত।

বর্ণানুসারে 'এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওন'-এর দেশগুলো হল-

Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kiribati, Korea, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand.

Name of National Scout Organization- NSO's

1. Scouts Australia
2. Bangladesh Scouts
3. Bhutan Scouts Association
4. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam
5. Cambodia Scouts
6. The General Association of the Scouts of China (Taiwan)

7. Fiji Scouts Association
8. Scout Association of Hong Kong
9. The Bharat Scouts & Guides
10. Gerakan Pramuka (Indonesia)
11. Scout Association of Japan
12. Kiribati Scout Association
13. Korea Scout Association
14. Persekutuan Pengakap Malaysia
15. The Scout Association of Maldives
16. The Scout Association of Mongolia
17. Nepal Scouts
18. Scouts New Zealand
19. Pakistan Boy Scouts Association
20. The Scout Association of Papua New Guinea
21. Boy Scouts of the Philippines
22. The Singapore Scout Association
23. Sri Lanka Scout Association
24. National Scout Organization of Thailand

Associate Members

1. The Scout Association of Macau
2. Polynesia Scouts Council

খ) সাংগঠনিক কাঠামো-

World Organization of the Scout Movement (WOSM)

↓

World Scout Conference

↓

World Scout Committee

↓

World Scout Bureau

↓

Africa Region	Arab Region	Asia-Pacific Region	Inter America Region	Europe Region	Euresia Region

গ) **কার্যাবলী**- ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে :-

০১. জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান।

০২. জাতীয় স্কাউট সমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপদেশ প্রদান।

০৩. প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন।

০৪. প্রোগ্রাম নীতিমালা প্রণয়ন।

০৫. বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী, বিশ্ব রোভার মুট, বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিশ্ব ইয়ুথ ফোরাম ইত্যাদি আয়োজন ও পরিচালনা।

০৬. সদস্য দেশগুলো ভ্রমণ করে জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান।

০৭. সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ (পত্র/ ই-কমিউনিকেশন) করে সম্পর্ক উন্নয়ন।

০৮. স্কাউটিং সম্পর্কিত বই, হ্যান্ডবিল, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশ করা এবং সদস্য দেশগুলোতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

০৯. স্কাউটিংয়ের উপর গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ ফল সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহকে প্রেরণ করা।

১০. সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠন কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে গৃহিত প্রকল্পের জন্য আর্থিক মঞ্জুরী সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

১১. সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠন কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা।

১২. সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহ থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক পরিসংখ্যান ও বার্ষিক প্রশিক্ষণ রিপোর্ট সংগ্রহ করে তা অবগতির জন্য ওয়ার্ল্ড স্কাউট কমিটির সভায় উপস্থাপন করা।

০২. বাংলাদেশের প্রচলিত আইন জানা।

ক) ট্রাফিক আইন সহ প্রচলিত ০৩টি আইন।

একজন নাগরিক হিসাবে দেশের সাধারণ আইন ও নিয়ম কানুন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। প্রাসঙ্গিক বিষয় নিজ দায়িত্বে জেনে তা মানতে হবে এবং অপরকে অবহিত করতে হবে। এখানে 'ট্রাফিক আইন' বিষয়ে আলোচনা করা হল।

ট্রাফিক আইনঃ

১. গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন রাস্তায় বাম দিক দিয়ে চলাচল করবে।

২. ট্রাফিক সিগন্যালের কাছে এবং রাস্তার মোড়ে গাড়ি গতি কমিয়ে আনতে হবে।

৩. রাস্তায় মোড় নেওয়ার সময় গাড়ির গতি কমিয়ে এনে যে দিকে চালক যেতে চায় সেই দিকে হাত দিয়ে বা গাড়ির ইন্ডিকেটর বাতি জ্বালিয়ে তার দিক নির্দেশ করবে।

৪. কোন গাড়িকে ওভারটেক করতে হলে হর্ণ বা বেল বাজিয়ে সামনের গাড়ির চালককে সাবধান করে দিয়ে সামনের গাড়িকে বাম দিকে রেখে ওভারটেক করতে হবে।

৫. রাস্তা চলার সময় ট্রাফিক সিগন্যালের পাশে বা অন্য কোন জায়গায় কোন কারণে থামতে বাধ্য হলে হাত উঁচু করে পেছনের গাড়িকে থামার সংকেত প্রদান করতে হবে।

ট্রাফিক চিহ্নঃ

গাড়ি চালকের সুবিধার জন্য রাস্তায় মাঝে মাঝে কিছু ফলক ব্যবহার করা হয়। ঐ ফলকগুলো গাড়ি চালকদের পথ সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য দেওয়া হয়। বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন ট্রাফিক চিহ্নগুলো হলো-

নির্দেশক চিহ্ন	হর্ণ বাজানো নিষেধ	গাড়ি পার্ক করা নিষেধ
ওভারটেক করা নিষেধ	গাড়ি প্রবেশ নিষেধ	ইউটার্ন নিষেধ
রাস্তা পারাপার নিষিদ্ধ	অসমতল পথ	গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ
বায়ে আঁকাবাঁকা পথ	রেলগেট	বায়ে সাইড রোড

০৩. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ঃ

জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আর এ উৎসকে সামনে রেখে এবং জনগণের অধিকার ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ভিত্তিক প্রশাসনকেই বলে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা। আর এ ব্যবস্থা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ। এলাকাভিত্তিক দুই ধরনের শাসন ব্যবস্থা বর্তমানে চালু রয়েছে।

i) প্রচলিত স্থানীয় শাসন।
ii) স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন।

স্থানীয় প্রশাসকদের নীতি নির্ধারণের কোন ক্ষমতা নেই। তারা শুধু নীতি বাস্তবায়নকারী। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকেই 'স্থানীয় সরকার' বলে অভিহিত করা হয়। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের আইনের আওতাধীন থেকে কাজ করে। নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত প্রহণ, প্রকল্প নির্ধারণ এবং এগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকে।

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, পৌর/সিটি কর্পোরেশন, থানা পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ইউনিয়ন পরিষদ

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই দেশে গ্রামীণ জনপদের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। কৃষি নির্ভরশীল এই বাংলাদেশে গ্রামের

মানুষের অধিকার ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়েছে। জনগণের খুব কাছে গিয়ে এই পরিষদ সেবা ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করে। পল্লী এলাকায়

কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত। আমাদের দেশের সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থানীয় শাসনে প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককের শাসনভার নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ন্যস্ত। আর এ প্রতিষ্ঠানগুলো জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসাধারণের কার্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন তথা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে জাতীয় সংসদ "ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা" সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন করে। অবশ্য ১৯৭৬ সনে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ "স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ" জারি করে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও পৌরসভায় সংগঠন ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন করেন। পরবর্তীতে সরকার ১৯৮৩ সনে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন) অধ্যাদেশ জারি করে। ইউনিয়ন পরিষদ গঠন প্রণালী নতুনভাবে নির্দেশ করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ঃ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান, নয় জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিন জন (সংরক্ষিত) মহিলা সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে তিন জন করে মোট নয় জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। থানা পরিষদ প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে এক জন করে মহিলা সদস্য মনোনীত করবে। পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর। কার্যকাল গণনা করা হবে পরিষদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে। একজন ব্যক্তি সদস্য বা চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ্য হবেন যদি তিনি অনূন্য ২৫ বছর বয়স্ক হন; সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচক মন্ডলীর তালিকাভূক্ত হন, সরকারী কর্মচারী না হয়ে থাকেন, আইনে ঘোষিত কোনভাবে অযোগ্য বিবেচিত না হন। চেয়ারম্যান বা এক জন সদস্যের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থের ক্ষতি বা অপপ্রয়োগের জন্য অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে। যদি সে প্রস্তাব মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহিত হয় তা হলে তিনি অপসারিত হবেন।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪,৫০৫ (ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত)।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ও কার্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন অধ্যাদেশে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী বহুমুখী। নিম্নে এর কার্যাবলীর বিবরণ দেয়া হল ঃ

(১) **উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন** ঃ কৃষি, বন, মৎস, গবাদি পশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধন।

(২) **উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন** ঃ থানা পরিষদ কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন।

(৩) **শান্তি রক্ষামূলক** ঃ পল্লী অঞ্চলে শান্তিরক্ষা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দেশের সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান নিরোধকল্পেও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই উদ্দেশ্যে গ্রাম্য পুলিশ সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখার কাজে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনকে সহায়তা করবে।

(৪) **পরিবার পরিকল্পনা** ঃ ইউনিয়ন পরিষদ জন্ম নিয়ন্ত্রণমূলক কাজকে অগ্রাধিকার দান করবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ মেলা অনুষ্ঠান, হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রে জন্ম নিরোধ ব্যবস্থা করা ইউনিয়ন পরিষদের কাজ।

(৫) **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা** ঃ ইউনিয়নে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব।

(৬) **পানি সরবরাহ** ঃ জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানীয় সরবরাহ ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম মুখ্য কাজ। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে কূপ, দীঘি ও পুকুর খনন এবং সেগুলোর তত্ত্বাবধান ইউনিয়ন পরিষদের করতে হবে।

(৭) **স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ** ঃ সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইনের মত সরকারী সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ইউনিয়ন পরিষদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(৮) **ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম যাচাই ঃ** ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং তাদের তৎপরতা সম্পর্কে থানা পরিষদের কাছে সুপারিশ পেশ করাও ইউনিয়ন পরিষদের একটি কাজ। জন্ম, মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক, দুঃস্থদের হিসাব সংরক্ষণ ও অন্যান্য পর্যায়ে শুমারি পরিচালনা ইউনিয়ন পরিষদকে করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস ঃ

১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব বাজেট থাকবে। থানা পরিষদ (উপজেলা পরিষদ) এর পূর্ব অনুমোদনসহ বিষয়গুলোর উপর ইউনিয়ন পরিষদ কর আরোপ করতে পারবে; (ক) গৃহস্থালী ও আবাসিক জমির মূল্যের উপর কর (খ) গ্রাম্য পুলিশের রেট; (গ) জন্ম, বিবাহ ও উৎসবের উপর ফি; (ঘ) জনগণের সুবিধার্থে পূর্ত কাজের উপর কম্যুনিটি কর; (ঙ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবামূলক কাজের জন্য ফি ইত্যাদি।

পৌরসভা ঃ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার পল্লী অঞ্চলের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ এবং একই আইনে শহর এরাকার জন্য পৌরসভা গঠিত। জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরো দৃঢ় করার জন্যই শহর এলাকার পৌরসভা ও শহর কমিটিকে একত্রিত করে সর্বক্ষেত্রে পৌরসভা চালু করা হয়েছে। ফলে এর সংখ্যা অতীতের চেয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১২ (মার্চ-২০১১) টি।

পৌরসভার গঠনঃ একজন মেয়র, কয়েকজন নির্বাচিত কমিশনার এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মনোনীত কয়েকজন মহিলা কমিশনার এর সমন্বয়ে গঠিত হবে। নির্বাচনের সুবিধার জন্য কয়েকটি পৃথক পৃথক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত থাকবে যা ওয়ার্ড বলে বিবেচিত হবে।

প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা/ওয়ার্ড থেকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একজন কমিশনার নির্বাচিত হবেন। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পৌরসভার নির্বাচিত সদস্যকে কমিশনার বলা হবে। পৌর এলাকার জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে পৌরসভার সদস্য সংখ্যা কম বেশি হবে। চেয়ারম্যান ও কমিশনার নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে এবং চেয়ারম্যান সমগ্র পৌরসভার ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। মহিলা কমিশনারের সংখ্যা নির্বাচিত কমিশনার এর সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশী হবে না। কার্যকাল ৫(পাঁচ) বছর। তবে অসদাচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার এর জন্য বা

পৌরসভার কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের জন্য অপসারিত হতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোট।

পৌরসভার কার্যাবলীঃ পৌরসভার কার্যাবলীকে সাধারণত ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। যা নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

(ক) উন্নয়নমূলক ঃ

০১) বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা।

০২) জনসাধারণের জন্য খোলা জায়গা, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ।

০৩) পথঘাট ও রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ।

০৪) সাধারণ মিলনায়তনের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।

০৫) জনসাধারণের রাস্তাঘাট ও সাধারণ স্থানের প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

০৬) রাস্তাঘাট ও সাধারণ স্থান পরিষ্কার রাখা, মৃত জন্তুর দেহ অপসারণ করা।

০৭) জনস্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেয়া সাধারণ ব্যবহার্য কোন পুকুর, দীঘি, কূপ প্রভৃতির পানি দূষিত হলে তার পানি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, পানীয়ের জন্য জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন পুকুরে, দীঘিতে বা অন্য কোথাও গবাদি পশুর গোসল নিষিদ্ধকরণ।

০৮) জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করা।

০৯) বন্যা, ভূমিকম্প, ক্ষরা, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি দুর্যোগের সময় সাহায্য ও সেবা কাজের ব্যবস্থা করা।

১০) এতিম, দুঃস্থ ও বিধবাদের সাহায্য করা ও এতিমখানা পরিচালনা।

১১) ফলমূল, শাক-সবজির চাষ বাড়ানো।

১২) জনসাধারণের খেলাধুলার ব্যবস্থা করা ও এর মান উন্নয়ন করা।

১৩) কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন ও সমবায় আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বাড়ানো।

১৪) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন।

১৫) লাইব্রেরী, পাঠাগার ও ক্লাব গঠন।

১৬) ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থা করা।

১৭) নারী, শিশু ও দুঃস্থদের কল্যাণমূলক কাজের ব্যবস্থা নেয়া।

১৮) শ্রেণী বিদ্বেষ, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নিরসন করা।

১৯) শহরে বসবাসকারী বা কোন আগন্তুক বা পর্যটকদের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা।

খ) শান্তি রক্ষামূলক ঃ শহরাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, বেসরকারী প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংস্থা গঠন করবে। শহর এলাকায় সরকারী কর বা ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য করাও এর অন্যতম কাজ।

গ) বিচার সংক্রান্ত ঃ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছোট ছোট বিবাদ বিসংবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য সালিসী আদালত গঠন করা। মেয়র হবেন এই অঞ্চলের চেয়ারম্যান।

ঘ) শিক্ষামূলক ঃ শহরের শিক্ষা বিস্তারের জন্য পৌরসভা বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন, অন্যান্য শিক্ষায়তন ও সংস্কৃতিক অর্থ সাহায্য দান, পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা কাজে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

ঙ) জনস্বাস্থ্যমূলক ঃ এটি শহরের জনস্বাস্থ্যমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করবে। সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ, কলেরা ও শিশুদের টিকাদান ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গৃহ নির্মাণ করবে এবং শহরের মধ্যে খাদ্য ও পানীয়ের নিয়ন্ত্রণ করবে।

চ) বিবিধ ঃ পৌরসভা শহরাঞ্চলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে মনযোগী হবে। তাছাড়া শহরের পরিকল্পনা, শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, শহর উন্নয়ন পরিল্পনা গ্রহণ করবে।

পৌরসভার কর্মকান্ড দেশের কয়েকটি মহানগরী সিটি করপোরেশন এর আওতাধীন।

সিটি কর্পোরেশন ঃ

৩১১ টি পৌরসভার মধ্যে ঢাকা (উত্তর, দক্ষিণ), চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর পৌরসভাকে সিটি করপোরেশন এ উন্নীত করা হয়েছে। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের সমন্বয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সিটি করপোরেশন প্রধানের পদটি মেয়র পদের মর্যাদায় ভূষিত হবে। মেয়রের কাজে সহায়তা করার জন্য ১ জন ডেপুটি মেয়র থাকবেন।

একটি পৌরসভার যাবতীয় কাজ সিটি করপোরেশন এর আওতাভুক্ত।

উপজেলা পরিষদ ঃ

উপজেলা পরিষদের নির্বাহী হিসেবে কাজ করবেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা UNO, যিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তাগণ UNO কে সহযোগীতা করবেন।

উপজেলা পরিষদ কার্যাবলী ঃ

১। উপজেলার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা।

২। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ সুপারিশ করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদগুলিকে পরামর্শ দান করে উন্নয়নমুখী কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করা।

৩। জেলার মধ্যে জেলা পরিষদ যে কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম জেলা পরিষদের প্রয়োজনানুসারে থানার মধ্যে সে সব কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের।

এছাড়া, সরকার কখনও কখনও উপজেলা পরিষদকে জেলা পরিষদের বা ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দিবে।

০৪. জাতিসংঘ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

জাতিসংঘের উৎপত্তির কারণ ঃ

(সম্মিলিত জাতিসংঘ বা United Nations Organization আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ইতিহাস তথা সম্মিলিত জাতিসংঘের জন্ম ইতিহাস)-

বর্তমান যুগ সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের যুগ। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই মানব জাতিতে সহযোগিতার ধারণা বিদ্যামান। তবে সে বহমান ধারণা আধুনিককালে এসে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা এবং ক্ষয়ক্ষতি দেখে যুদ্ধ নয় শান্তির লক্ষ্যে ১৯২০ সনে স্থাপিত হয় লীগ অব নেশনস (League of Nations)। যা সর্বপ্রথম সু-সংগঠিত সংস্থা। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র প্রধানদের দুর্দমনীয় প্রতিহিংসা পরায়নতা লীগ অব নেশনস্‌কে ব্যর্থ করে দেয়। ফলে ১৯৩৯ সনে

অতীতের সকল ভয়াবহ যুদ্ধের হিংস্রতাকে ম্লান করে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আণবিক বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি। হাজার হাজার মানুষ পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তীব্র ভয়াবহতা দেখে বিশ্ব সভ্যতা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সকলেই উপলব্ধি করে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধু পৃথিবীর কোন অংশ নয় বরং গোটা পৃথিবী নামক গ্রহটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৪টি মিত্র শক্তি লন্ডনে এক যুক্ত ইশতেহারে পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত করার আহবান জানায়। ইত্যবছরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইতেহারে চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। উক্ত বৈঠকে দুই নেতা যে সনদ স্বাক্ষর করেন তা আটলান্টিক চার্টার (Atlantic Charter) নামে খ্যাত। উক্ত সনদে (Charter) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের মূলনীতির উল্লেখ ছিল। পরে মিত্র শক্তির সদস্যবৃন্দ উক্ত সনদে স্বাক্ষর করেন।

১৯৪২ সনের ১ জানুয়ারি মিত্রশক্তির ২৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ অশক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের এক দলিল স্বাক্ষর করেন। উক্ত দলিল যুদ্ধশেষে সম্মিলিত সংঘ গঠনের বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪৩ সনে মস্কো ও তেহরানে- ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত, রাশিয়া এবং চীন মিত্রশক্তির প্রতিনিধিবর্গ দুটি সম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলন দুটিতে সম্মিলিত জাতিসংঘ U.N.O. গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ জন্ম লাভ করে। বর্তমানে এর সদস্য দেশ ১৯৩ টি।

সম্মিলিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of The UN)

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করা হল-

১। শান্তির প্রতি হুমকি রোধ করা এবং সকল প্রকার আক্রমণাত্মক প্রবণতা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২। আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্য আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করে যৌথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মধ্যস্থতা, আপোষ ও সালিসীর মাধ্যমে বিবাদমান পক্ষগুলোকে শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়তা করা।

৩। সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমে জাতিতে-জাতিতে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব জোরদার করা। পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রদান করা।

৪। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা।

৫। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবিক মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ভাব গড়ে তোলা।

৬। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও শ্রমিক কল্যাণের উন্নতি বিধান করা।

৭। উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলীকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কেন্দ্ররূপে জাতিসংঘকে পরিচালিত করা। জাতিসংঘ তার উদ্দেশ্যাবলীকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তবে তা কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে চলেছে।

(খ) জাতিসংঘের প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যাবলী ঃ

জাতিসংঘের ০৬টি শাখা রয়েছে। শাখাগুলি হচ্ছে-

১. সাধারণ পরিষদ

২. নিরাপত্তা পরিষদ

৩. অর্থনৈতিক ও সামজিক পরিষদ

৪. অছি পরিষদ

৫. আন্তর্জাতিক আদালত

৬. সম্পাদকীয় দপ্তর

নিম্নে সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামজিক পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

১.১ সাধারণ পরিষদ (General Assembly)

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ইহা জাতিসংঘের আইনসভা স্বরূপ। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই এর সদস্য হতে পারে। নিচে সাধারণ পরিষদের পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করা হলো ঃ

গঠন প্রণালী (Compositon) ঃ জাতিসংঘের সকল সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৫- তে উন্নীত হয়েছে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র

০৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে পাঠাতে পারেন। তবে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র একটি মাত্র ভোটের অধিকারী। বছরে এক বার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসে। সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার হতে এর অধিবেশন শুরু হয়।

কার্যাবলি (Functions) ঃ সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভা স্বরূপ। এখানে বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হয় এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই একে আলোচনা সভা বললেও ভুল হবে না। নিম্নে এর কার্যাবলি আলোচনা করা হলোঃ

১। আলোচনা সংক্রান্ত কাজ (Deliderative functions) ঃ
জাতিসংঘ সনদে উল্লেখিত সকল বিষয় নিয়ে সাধারণ পরিষদ আলোচনা করতে পারে। তবে এটা এমন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে না যা নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাধীন কিংবা নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। কোন বিষয়ে আলোচনার পর পরিষদ উক্ত বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণ করে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার পর বিষয়টিকে নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরণ করতে পারে।

২। নির্বাহী সংক্রান্ত কাজ (Administrative functions) ঃ
সাধারণ পরিষদ তার কার্য পরিচালনার জন্য কার্যবিধি প্রণয়ন করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সেক্রেটারি জেনারেলকে নিয়োগ করে এবং নতুন সদস্য গ্রহণ এবং কোন সদস্য রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ কোন গুরুতর সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদ সমবেতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে সামরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে।

৩। নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ (Electoral functions) ঃ
সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন করে। এটা নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী ১০ জন সদস্য নির্বাচন করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য এবং অছি পরিষদের সদস্য নির্বাচন করে এবং নিরাপত্তা পরিষদের সাথে যুক্তভাবে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নির্বাচন করে।

৪। আর্থিক কাজ (Financial Functions) ঃ
সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের বাজেট প্রণয়ন ও পাস করে এবং অন্যান্য সংস্থার বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন করে। এছাড়া সদস্য রাষ্ট্রের দেয় চাঁদার পরিমান

নির্ধারণ করার দায়িত্ব সাধারণ পরিষদের ওপর ন্যস্ত। সদস্য রাষ্ট্রের আর্থিক সামর্থ্য বিচার বিবেচনা করে চাঁদার হার স্থির করে।

৫। রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনা (Receives and Evaluates Reports) ঃ
জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা তাদের বার্ষিক রিপোর্ট সাধারণ পরিষদের কাছে পেশ করে। সাধারণ পরিষদ ঐসব রিপোর্ট পর্যালোচনা করে। এরূপে পরিষদ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন সংস্থায় সম্পাদিত কাজের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং কোন সংস্থাকে এর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার সুপারিশ করতে পারে। সাধারণ পরিষদ একটি বিরাট সংস্থা। তাই এর কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য কতগুলো কমিটি গঠন করা হয়; কমিটিগুলো পরিষদের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে থাকে। সাধারণ পরিষদের ছয়টি কমিটি রয়েছে। ক) রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা কমিটি খ) অর্থনৈতিক কমিটি গ) সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক কমিটি ঘ) অছিগিরি কমিটি, ঙ) শাসন ও বাজেট কমিটি এবং চ) আইন কমিটি।

১.২ নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)

নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার মূল দায়িত্ব এর ওপর ন্যস্ত। নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিসংঘের শাসন বিভাগ বলা যায়। এর গঠন কাঠামো এবং মর্যাদা ও ক্ষমতা একে অন্যান্য সংস্থা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী করেছে।

গঠন প্রণালী (Compostion) ঃ

জতিসংঘের জন্মলগ্ন হতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ ৫টি এবং ৬টি অস্থায়ীসহ মোট ১১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু ১৯৬৬ সাল হতে ইহা ৫টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ীসহ মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়ে আসছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স ও গণচীন। অস্থায়ী সদস্যগণ দু'বছরের জন্য সাধারণ পরিষদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। কোন বিদায়ী সদস্য সাথে সাথে পুনঃরায় নির্বাচিত হতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদ সার্বক্ষণিক পরিষদ। এর সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণকে সর্বদায় সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকতে হয়। সদস্য রাষ্ট্রের নামের ইংরেজি বর্ণমালার আদ্যক্ষর অনুয়ায়ী প্রতিনিধিদের মধ্যে হতে পালাক্রমে প্রতি মাসের জন্য একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

নিরাপত্তা পরিষদের কাজ (Functions) ঃ

নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের হৃৎপিন্ড স্বরূপ। এর কর্ম তৎপরতার ওপর বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল। তাই নিরাপত্তা পরিষদকে বিশ্ব শান্তির অভিভাবক বলা হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সুমহান লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদ নিম্ন বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে ঃ

১। শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ (Maintenance of Pecace and Security) ঃ নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি সংক্রান্ত ঘটনার অনুসন্ধান করে এবং শান্তি বিনষ্টকারী বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের সুপারিশ করে। আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপোষ ও সালিসির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

২। শান্তির জন্য প্রতিরোধ ও প্রতিশোধমূলক কাজ (Protective and Retaliative Functions) ঃ শান্তি ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সাথে আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, কুটনৈতিক এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত অবরোধ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানাতে পারে। এটা ব্যর্থ হলে এবং শান্তি ভঙ্গকারী রাষ্ট্র বাড়াবাড়ি করলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অপরাধী রাষ্ট্রের পরিষদের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করতে পারে। জাতিসংঘের নিজস্ব সামরিক বাহিনী নেই। তবে জাতিসংঘের আহবানে মনোনীত সদস্য রাষ্ট্রগুলো সম্মিলিত বাহিনী প্রেরণ করে।

৩। নির্বাহী সংক্রান্ত কাজ (Executive Functions) ঃ নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কোন কাজের সুপারিশ করতে পারে। এটা জাতিসংঘের নতুন সদস্য গ্রহণ, কোন সদস্য রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করতে পারে। জাতিসংঘের মহাসচিব বস্তুত নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ লাভ করেন। এটা সাধারণ পরিষদের সাথে মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নিয়োগ করে।

১.৩ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic And Social Council)

বিশ্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এটা একটি উন্নয়নের সাহায্যকারী সংস্থা। বিশ্বের অনুন্নত ও অনগ্রসর জাতির ব্যাপারে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নিচে এর গঠন ও কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলোঃ

গঠন প্রণালী (Composition) ঃ

অর্থনতিক ও সামাজিক পরিষদ বর্তমানে ৫৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এর সকল সদস্য তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি বছর অন্তর এর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। বছরে অন্তত দু'বার অধিবেশন বসে এবং সাধারণ পরিষদের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে। উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কার্যাবলি (Functions) ঃ

কৃষি, খাদ্য শ্রম ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সাহায্য ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিম্নোক্ত কাজ সম্পাদন করে ঃ

১। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, শ্রম, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজের পর্যালোচনা গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সাহায্য ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এটা সাধারণ পরিষদের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করে।

২। বিশ্বকে সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার লক্ষে কৃষি, খাদ্য, চিকিৎসা, যোগাযোগ, বাণিজ্য সাহায্য ও পুনর্বাসন এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।

৩। মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষা এবং অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণের মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, নির্বিশেষে সকলের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৪। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত কার্যরত সকল সরকারি, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গভীর যোগাযোগ ও সহযোগিতা রক্ষা করে এর অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য তাদের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানায়।

৫। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ তার বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের মাধ্যমে কাজ করে এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষ সংস্থার মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে। এটি ১৫টি বিশেষ সংস্থা, ১২টি কমিশন এবং ৫টি সাব-কমিশনের মাধ্যমে তার ব্যাপক ও বিস্তৃত কার্যাবলি সম্পাদন করে।

এরূপে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং সাহায্য ও পূণর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মসূচী সম্পাদনের মাধ্যমে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে যেসব সংস্থার সহযোগিতা লাভ করে সেগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO), সাহায্য ও পুনর্বাসন সংস্থা (RARA), আন্তর্জাতিক তহবিল (IMF), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংঘ (IDA), আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

০৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ

আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলতে জাতির সার্বিক মানকে বুঝায়। একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর সে জাতির উন্নয়ন নির্ভরশীল। জাতিগতভাবে সে জাতি তত উন্নত যে জাতির আর্থ-সামাজিক অবস্থা যত উন্নত। বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশগুলির অন্যতম। জাতি হিসেবে বাঙ্গালীরা বিশ্বব্যাপী পরিচিত হলেও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। সম্মিলিত সচেতনতা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই জাতিগতভাবে আমাদের উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশের মৌলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা যেমন রয়েছে; তেমনিভাবে এসবের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যাবলীর প্রভাব রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা, সমস্যাবলীর প্রভাব ও সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ক) বাংলাদেশের মৌলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নির্ণয় করে প্রতিটি ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০৩টি কারণ নির্ধারণ করে দেখানো প্রয়োজন। যেমন-

ক) দারিদ্রতা, খ) জনসংখ্যার বৃদ্ধি, গ) বেকারত্ব।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ও সমস্যাবলীর প্রভাবঃ বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো হলো- দারিদ্রতা, জনসংখ্যা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, ভিক্ষাবৃত্তি, কুসংস্কার প্রভৃতি। এই সমস্যাগুলি একটি অন্যটির সাথে অনেকটা সম্পর্কযুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে একটি অপরটির কারণে উদ্ভব হয়। এ সমস্যাগুলো আবার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভীষন প্রভাব ফেলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মারাত্মকভাবে অর্থনীতির উপর চাপ পড়ছে। বাড়ছে বেকারত্ব। মানুষ

সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কুসংস্কার ও দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক দিক থেকে সবার জন্য সব চাহিদা পূরণে ব্যাঘাত ঘটছে। সমাজে নানা রকম জটিলতা দেখা দিচ্ছে। বাল্য বিবাহ, যৌতুক, স্বাস্থ্য সমস্যা, কুসংস্কারের প্রভাব যেমন- ভূত-প্রেত, যাদু-টোনা প্রভৃতি সমাজকে কলুসিত করছে।

বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। উপযুক্ত শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবে কর্মসংস্থান বাঁধাগ্রস্ত। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের অভাবেও কর্মসংস্থান ব্যহত হচ্ছে। দেশে শিক্ষার হার নগণ্য, চাপ পড়ছে অন্যান্য চাহিদা পূরণে। ভিক্ষাবৃত্তি যে কোন জাতির জন্যই মৌলিক সমস্যা। বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করতে গেলে এটি একটি প্রকট সমস্যা। এটি সামাজিক সমস্যা। দিন দিন এর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ভিক্ষাবৃত্তিকে পারিবারিকভাবেও অনেকে পেশা হিসাবে বেছে নিচ্ছে। পঙ্গুত্ব এক ধরণের সামাজিক সমস্যা যার কোন সুষ্ঠু সমাধান নেই।

উল্লেখিত প্রত্যেকটি সমস্যা বাংলাদেশের জন্য মৌলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা। এর ফলে অর্থনীতিতে মারাত্মক চাপ পড়ছে।

খ) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ০৫টি সুপারিশ প্রণয়ন।

বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যাগুলো নিম্নলিখিতভাবে সমাধান করা যেতে পারে, যেমন-

১। শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। যার ফলে মানুষ প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজে পাবে। এর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও গণশিক্ষা চালু করতে হবে।

২। অধিক জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সঠিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৩। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অধিক হারে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে সেই অনুযায়ী স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য চেষ্টা করা। অনেক বেশি বেশি কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য শিক্ষা শেষে কোনমতেই চাকুরীর আশা না করে যে কোন উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান নিজেকেই করতে হবে।

৪। ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে হলে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের বাধ্যতামূলক কাজে যোগদান, শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ, অন্ধ ও পঙ্গু ভিক্ষুকদের পূণর্বাসন প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করে হলেও এই পেশাকে নির্মূল করতে হবে।

উল্লেখিত সমস্যাগুলোর সমাধানে সঠিক নীতি প্রয়োগ করতে পারলেই দারিদ্রতাসহ নানাবিধ পারিপার্শ্বিক সমস্যা আর নতুন করে সৃষ্টি হবে না। এর জন্য প্রথম যা প্রয়োজন তা হল ব্যাপক নাগরিক সচেতনতা ও নীতি নির্ধারকদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা।

অর্থনৈতিক ও সামজিক সমস্যা

যখন কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের ঘাটতি দেখা যায়, তখনই সেই জনগোষ্ঠীতে দেখা দেয় বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমস্যা এবং সঠিক নীতিমালা নির্ধারণের ব্যর্থতার কারণে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য দেশের সরকারের সাথে সাথে সচেতন নাগরিকদেরও রয়েছে বিরাট দায়িত্ব। রোভার স্কাউটরা সেই দায়িত্বশীল নাগরিকদের একাংশ। ফলে এর সামাধানকল্পে রোভার স্কাউটদের রয়েছে বিশেষ কর্তব্য, যা রোভার স্কাউটরা বিভিন্নভাবে প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং একই সাথে সরাসরি অংশ নিয়ে সমাধান করতে পারে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত। ফলে বই পত্র পড়ে তাদের পক্ষে কিছুই বুঝা সম্ভব হয় না। যার ফলে অনেক সময় তাদের কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা তার সঠিক ব্যবহার করতে পারেনা। রোভার স্কাউটরা তাদের শেখাতে পারে উন্নত ধরণের কৃষি ব্যবস্থা, তাদের শেখানো যেতে পারে ফার্মিং (পোলট্রি, ডেইরী, ফিসারিজ, বি-কিপিং ইত্যাদি)। সেই সাথে চাহিদা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করে তাদেরকে কুটির শিল্পে উৎসাহিত করা যেতে পারে। একইভাবে রোভার স্কাউটরাও সরাসরি একক বা যৌথভাবে তাদের সাথে কাজ করতে পারে। সেই সাথে তাদেরকে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানিয়ে তা ব্যবহারে উৎসাহিত করতে পারে। দেশীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে এর মানও বৃদ্ধি পাবে এবং দেশীয় শিল্পেরও উন্নয়ন ঘটবে, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। এমন ভাবে কাজ করে গেলে দেশ থেকে যেমন বেকারত্ব কমে যাবে, ঠিক একইভাবে সম্পদের সঠিক ব্যবহারও বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করতে রোভার স্কাউটরা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারে। একই সাথে শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা চালাতে পারে। সেই সাথে নিজেদেরকেও পড়ালেখার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। একই সাথে জনগণকে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি থেকে

মুক্ত থাকার উপায় এবং এর চিকিৎসার ব্যাপারে সচেতন করা যেতে পারে। সেই সাথে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে রোভাররা জ্ঞানদান করতে পারে।

সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য রোভার স্কাউটরা বিনোদনের সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। নিজ মহল্লায় পাঠাগার, স্পোর্টস কাব, সাংস্কৃতিক সংগঠন এমনকি স্কাউট ইউনিট গড়ে তুলে অনেক বেশি সংখ্যক তরুণ ও যুবকদের অবসর সময়কে ভাল পথে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া যায়। ফলে যুব সমাজ অবক্ষয়ের হাত থেকে বহুলাংশে রক্ষা পাবে। একই সাথে এই সংগঠনসমূহের মাধ্যমে বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দৈব দূর্ঘটনায় সংঘবদ্ধ মোকাবেলা করা সম্ভব। সে সাথে সামাজিক অন্যায়সমূহের প্রতিরোধও সহজ হবে।

একজন রোভার স্কাউট যদি 'সেবা' মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে, এইভাবে তার দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যায় তার তাহলে আমাদের পুরো জাতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্যস্যাবলী সমাধানকল্পে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে বলে আশা করা যায়।

পারিবারিক জীবন শিক্ষা

পারিবারিক জীবন শিক্ষা বিষয়ে রোভার স্কাউটগণ বিশেষ অবদান রাখতে পারে। সমাজের অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে শিশুরা যে ০৬টি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে অধিকহারে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে, যেমন- হাম, পোলিও, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি ও যক্ষা ইত্যাদির মারাত্মক ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জানিয়ে তাদের শিশু-সন্তানদের টিকাদান কেন্দ্রের অবস্থান, টিকাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়ে টিকা দেওয়ায় উৎসাহিত করা এবং গ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। ডায়রিয়া প্রতিরোধ পদ্ধতি এবং ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইন তৈরির পদ্ধতি ও ব্যবহার বিধি, আয়োডিনের প্রয়োজনীয়তা, গলগন্ড রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, কুষ্ঠ রোগ সম্বন্ধে অবহিকতরণ এবং রোগীকে নিকটস্থ কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্রে গমনের জন্য উৎসাহিত করা এবং তা নিশ্চিত করা। এছাড়া বাড়ীর পরিবেশ উন্নতিকল্পে সঠিক স্থানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা, গাছ লাগানো, বাগান করা,

হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহদান এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা। এছাড়া অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখা। রোভার স্কাউটদের এই দায়িত্বসমূহ যদি তারা সঠিকভাবে পালনের সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে আমরা এমন সব পরিবার আমাদের আশেপাশে দেখতে পাব, যা সব যুগে সব জাতিরই আদর্শ বলে পরিগণিত।

স্ব-কর্মসংস্থান

স্ব-কর্মসংস্থান শব্দটি বহুল উচ্চারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। শব্দটির অর্থ অনুধাবন করতে আগে আমাদের বেকারত্বকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই দেশের জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ বেকারত্বকে দিন দিন প্রকট করে তুলছে। সব ভূক্তভোগীরাই এর স্বরূপ সম্বন্ধে কমবেশী ভালভাবে অবগত। জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিকেই বেকারত্বের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও এর আসল কারণ হচ্ছে আমাদের মানসিক অবস্থা, অর্থাৎ কোন কাজকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ণ করছি। আমাদের দেশের কর্মক্ষম ০৬ কোটি মানুষের মধ্যে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে হয়তো ০৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। তবে বাকি বেকার মানুষ কি করবে? স্ব-কর্মসংস্থানই হচ্ছে এর সমাধান। নিজের উদ্যোগে কোন কাজ সংগঠিত করে তার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করাকেই স্ব-কর্মসংস্থান বলে। এতে শুধু নিজেরই আয় হয় না, সাথে আরো একাধিক বেকারের কর্মের সুযোগ তৈরি হয়। কাজেই আমাদের উচিত সৃজনশীল মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে চাকুরীর পিছনে না ঘুরে স্ব-কর্মসংস্থান পদ্ধতিকে ব্যবহার করে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।

স্ব-কর্ম সংস্থানের জন্য রোভার স্কাউটরা তাদের সামর্থ্য অনুসারে অর্থ নিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। এছাড়া তারা ভিন্নতর প্রকল্পও হাতে নিতে পারে। তবে স্থানভেদে তার তারতম্য হবে। যেমন: শহরে যে ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য বা প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। তার সবটাই গ্রামে সম্ভব নয়। আবার গ্রামের ক্ষেত্রেও এই কথাটিই প্রযোজ্য। তাই আমাদের প্রকল্প গ্রহণের আগে এই ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

নিম্নে শহর ও গ্রামভিত্তিক কিছু স্ব-কর্মসংস্থানের উপায়সমূহ আলোচিত হলো।

গ্রামঃ গ্রামের কথা চিন্তা করলেই চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে উঠে তা হচ্ছে, বিস্তৃত জমি, পুকুর, বিল ইত্যাদি। তাই এগুলোকে নিয়েই চিন্তা ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়। যেমন- এইসব জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে বিভিন্ন শস্য, ফল বা ফুলের চাষ

করা যেতে পারে। তা ছাড়া পোলট্রির মাধ্যমে উন্নত প্রজাতির হাঁস মুরগী পালন করে ডিম অথবা মাংস উভয়ের সংস্থান করা সম্ভব। আবার পুকুরে মাছ চাষও করা যেতে পারে। বর্তমানে নিবিড় চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে অর্ধেক খরচে মাছ-মুরগী বা মাছ-হাঁস একই সাথে পালন/উৎপাদন করা সম্ভব। এ ছাড়া গবাদি পশু পালন যেমন- গরু, ছাগল পালন খুবই লাভজনক প্রকল্প।

এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিজের জমি বা পুকুর না থাকলেও গ্রামে অনেক পতিত পুকুর ও জমি অব্যবহৃত অবস্থায় থাকতে দেখা যায়, তা লিজ নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে নতুন পুকুর খনন যেতে পারে।

এছাড়া সরকারের খাস জমিও লিজ নিয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এ জন্য এককভাবে অর্থের সংস্থান না হলে সমবায় ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। গ্রামে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বা পোষাক তৈরির ক্ষুদ্র শিল্পও গড়ে তোলা যায়, তা খুবই লাভজনক। গ্রাম ভিত্তিক আরেকটি খুবই লাভজনক প্রকল্প হচ্ছে মধুর চাষ বা মৌমাছি পালন, যার জন্য খরচ খুবই কম।

শহরঃ শহরভিত্তিক স্ব-কর্মসংস্থান এর সুযোগ খুবই ব্যাপক ভিত্তিতে এ সুযোগ নেয়া যায় একক বা সমবায় ক্ষেত্রে। তবে মুক্ত জমিজমার পরিমাণ খুবই কম বিধায় চাষাবাদ বা মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে সুযোগ কম।

গ্রামের মত শহরেও উন্নত প্রজাতির হাঁস-মুরগী (পোলট্রি) ইত্যাদি পালনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। গবাদি পশু গরু-ছাগল পালনেরও ব্যবস্থা (ডেইরী) গ্রহণ করা যায়। যার জন্য খুবই সীমিত জায়গার প্রয়োজন হবে। এ ছাড়া এ্যাকুরিয়ামে মাছ উৎপাদন সহ কবুতর, কোয়েল ইত্যাদি পাখি পালন করা যায়। মধুর চাষ বা মৌমাছি পালন বা ছোট আকারের পোষাক তৈরির শিল্প স্থাপন করা সম্ভব। বিশেষ

করে ছোটদের পোষাক তৈরির জন্য। ছাপার কাজ বা কাপড়ে ডিজাইন করার জন্য ফেব্রিকস প্রিন্ট, বাটিক প্রিন্ট বা স্কীন প্রিন্ট কারখানা স্থাপন, ছোট খাট যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা স্থাপন, অটোমোবাইল রিপেয়ারিং সপ, রেডিও, টিভি, রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশন রিপেয়ারিং সপ। এ ছাড়া অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি মেরামতের দোকান, প্লাম্বিং ও সেনিটারী রিপেয়ারিং সপ, কাঠের সরঞ্জামাদি তৈরির কারখানা, বই বাঁধাই এর দোকান ইত্যাদি স্থাপন করা যেতে পারে। চুক্তি ভিত্তিতে বা সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা মিশুক, বেবী ট্যাক্সি বা টেম্পু ইত্যাদি চালিয়েও আজকাল অনেক শিক্ষিত বেকার কর্মের সংস্থার করছে। কম্পিউটার, শর্টহ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমেও অন্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়।

এ ধরনের স্ব-কর্ম সংস্থানের একটি বিরাট সুবিধা হচ্ছে, তুলনামূলকভাবে কম পুঁজি এবং অধিক লাভ, যেহেতু লাভ অধিক তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। আর এই দক্ষতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যেতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে খুব অল্প খরচে। এ ছাড়া বর্তমানে রেডিও, টিভি এবং পত্র-পত্রিকায় স্ব-কর্ম সংস্থানের জন্য বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন করে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কিছু কিছু বইপত্র ও সরকারী সংশ্লিষ্ট অফিসে বা মার্কেটে পাওয়া যায় যা উদ্যোক্তাদের জন্য খুবই সহায়ক। পুঁজির অভাবও সমবায়ের মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন ব্যাংকও সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে এবং সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষিত বেকাররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে আশা করা যায় অচিরেই আমাদের এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অভিশাপ না হয়ে বরং আমাদের জন্য উন্নতিই বয়ে আনবে। ফলে উন্নত হবে আমাদের জন জীবন, স্বচ্ছ হবে সামাজিক অবস্থান।

গ) জাতীয় বাজেট কি তা জানা।

শব্দটি মূলত ফরাসি শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ হল ছোট 'থলে' বা 'ব্যাগ'। ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী কমন্স সভায় বিবৃতিদানের উদ্দেশ্যে সরকারি হিসাব নিকাশের কাগজপত্র ব্যাগে করে নিয়ে যেতেন। আর এ ধারণা থেকে বাজেট কথাটি ১৭৩৩ সালে প্রথমবারের মত ব্যবহার করা হয়।

সাধারণত, বাজেট বলতে কোন নির্দিষ্ট অর্থ বছরের সরকারের প্রত্যাশিত আয় ও পরিকল্পিত ব্যয়ের অগ্রিম হিসাবকে বুঝায়। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন- Professor Bye and Hewett (Applied Economics)- এর মতে, "বাজেট হল প্রধানত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকারের আর্থিক প্রয়োজনে পূর্বাহ্নে সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রণীত একটি হিসাব যা আইন সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়"।

অর্থনীতিবিদ Johne F. Due -বলেন, "বাজেট হল প্রধানত একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের গৃহীত আর্থিক পরিকল্পনা।" তিনি আরও বলেন, "একটি সরকারি বাজেট হচ্ছে বর্তমান এবং অতীত সময়ের প্রকৃত ব্যয় এবং আয়ের তথ্যসহ আসন্ন সময়ের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় এবং প্রত্যাশিত আয়ের একটি বিবৃতি।"

অতএব, কোন দেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে সরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশকে বাজেট বলা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট বলতে, নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে (জুলাই-জুন) সরকারের সম্ভাব্য ব্যয়ের খাতসমূহ ও ব্যয়ের পরিমাণের সাথে প্রত্যাশিত আয়ের খাতসমূহ ও আয়ের পরিমাণ জাতীয় সংসদের (আইনসভা) মাধ্যমে অনুমোদিত দলিলকে বুঝায়। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট দু'টি ভাগে বিভক্ত। যথা- (ক) রাজস্ব বাজেট ও (খ) মুলধন বাজেট।

(ক) রাজস্ব বাজেট ঃ রাজস্ব বাজেটে সরকারের রাজস্ব খাতের আয় ও ব্যয় দেখানো হয়। বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসগুলো হল- আয় ও মুনাফার উপর কর, সম্পত্তি ও সম্পদ কর, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, বিদ্যুৎ শুল্ক, রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ, মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রয়, লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, প্রশাসনিক ফি, টোল ও লেভি, তার ও টেলিফোন বিল ইত্যাদি। পক্ষান্তরে রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো হল সাধারণ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা, পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সমাজ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ।

(খ) মুলধন বাজেট ঃ মুলধন বাজেট দ্বারা সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসেবা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রভৃতি জন্য ব্যয় নির্ধারণ করে। এজন্য প্রতি বছর একটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী আয়ের উৎস মূলত দু'প্রকার। যথা-

(ক) অভ্যন্তরীণ উৎস ও

(খ) বৈদেশিক উৎস।

অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার নিজস্ব সম্পদ, বিভিন্ন বন্ড এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত অভ্যন্তরীণ ঋণ ইত্যাদি। অন্য দিকে, বৈদেশিক উৎস হল বিভিন্ন বন্ধু দেশ থেকে প্রাপ্ত দান, অনুদান ও ঋণ।

বাজেট যেকোন দেশের সার্বিক অগ্রগতির চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। এতে করে সরকার দেশের নির্দিষ্ট খাতসমূহে অর্থ ব্যয়ের সাংবিধানিক যোগ্যতা লাভ করে। আমাদের দেশে সাধারণত জুলাই হতে শুরু করে পরবর্তী বছরের জুন মাস পর্যন্ত এক অর্থ বছর হিসাবে ধরা হয়। প্রতিটি অর্থ বছরের প্রারম্ভে জাতীয় বাজেট আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। প্রশিক্ষণ স্তরের রোভার স্কাউট হিসাবে একজনকে দেশের এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট এক বছরের বাজেটের সর্বোচ্চ ব্যয়ের খাত, সর্বনিম্ন ব্যয়ের খাত, সর্বমোট বরাদ্দকৃত বাজেট অর্থ, হ্রাসকৃত খাতসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হবে।

০৬. রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

ক) মাই প্রোগ্রেস বই সংরক্ষণ করা-

একজন রোভার স্কাউটকে প্রশিক্ষণ স্তরে উত্তীর্ণের পর থেকে পরবর্তী স্তরে পৌঁছা পর্যন্ত এই স্তরের সিলেবাসভুক্ত প্রতিটি বিষয়ে ক্রু-মিটিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত রোভার স্কাউট লিডারের নিকট থেকে ধারাবাহিকভাবে আমার স্কাউট রেকর্ড বইতে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে।

খ) লগ বই লিপিবদ্ধকরণ-

একজন রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ স্তরে উত্তীর্ণের পর থেকে পূর্ববর্তী স্তরের ন্যায় এই স্তরের সিলেবাসের প্রতিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রশিক্ষণ লব্ধমান সংক্ষিপ্ত

আকারে লগ বইতে লিপিবদ্ধকরণ অব্যাহত রাখতে হবে। স্তর ভিত্তিক কাজের বিবরণী যে বইয়ে করা হয় তাই হল 'লগ বই'। সম্পন্নকৃত কাজের বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক ছবি/কাগজ লগ বইয়ের সাথে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত করতে হবে। 'লগ বইয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশের ধারণা পেতে একটি নমুনা লগবই সংগ্রহ করে তা অনুসরণ করা যেতে পারে।

০৭. ব্যবহারিক দক্ষতা ঃ

ক) কমপক্ষে ২টি পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরি করা।

শেয়ার লেগ, সি ছ, লেডার, ট্রাসেল লেগ, ট্রান্সপোর্টার, লিপ্টার, ট্রাইপট, ফ্ল্যাগ ষ্ট্যান্ড, ট্র্যাপেজ, পোল মাংকি, রোপ মাংকি, স্টিল্ট টাওয়ার, অবজারবেশন টাওয়ার, পিরামিড টাওয়ার, ট্রাসেল ব্রিজ, ডেরিক, লেডার ব্রিজ, রোপ কমান্ডো, এরিয়েল রানওয়ে, ভেলা, মেরী গো রাউন্ড ইত্যাদি হতে কমপক্ষে দু'টি।

নিম্নে পোল মাংকি এবং কমান্ড ব্রীজ সহ তিনটি পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট-এর চিত্র দেওয়া হলো। রোভার গ্রুপের অন্যান্য রোভার স্কাউটদের সাথে নিয়ে রোভার স্কাউট লিডার অথবা সিনিয়র রোভার মেটের তত্ত্বাবধানে ব্যবহারিক (তৈরি ও অতিক্রম) কাজ সম্পাদন করতে হবে।

পোল মাংকি ব্রীজ

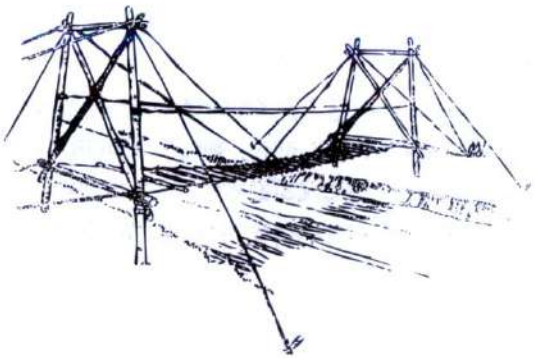

খ) সাঁতার জানা

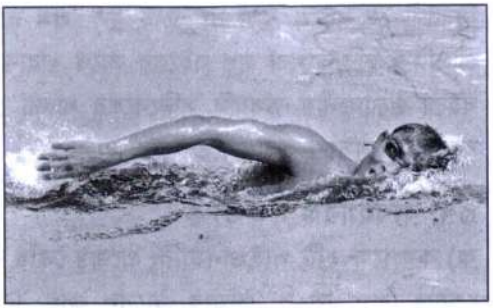

(যেমন: সাধারণ সাঁতার, বুক সাঁতার, প্রজাপতি সাঁতার, চিৎ সাঁতার)।

সুইমিং পুল, পুকুর বা নদীতে গিয়ে সাঁতার জানে এমন ব্যক্তির নিকট থেকে পানিতে ভাসার কৌশল সম্পর্কে জেনে বর্ণিত সাঁতার সম্পর্কে প্রদর্শন করার মাধমে এ বিষয় সম্পন্ন হবে।

গ) বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম।

বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রমটি সদস্য স্তর থেকে শুরু হয়েছে। আমরা জানি পৃথিবীব্যাপী ৩০ মিলিয়নের বেশি (মার্চ ২০১১) স্কাউট সদস্য স্কাউট আন্দোলনে জড়িত আছে। সদস্য স্তরে তৈরিকৃত বন্ধু ব্যতিত বর্তমান সময়ে নতুন করে কমপক্ষে ০১টি দেশী এবং ০১টি বিদেশী নতুন বন্ধু তৈরি করতে হবে। মনে রাখতে হবে বন্ধুরা স্কাউট, নন স্কাউট উভয়ই হতে পারে। তবে স্কাউট হলেই ভাল হয়, আর নন স্কাউট হলে তাকে স্কাউট আন্দোলন সম্পর্কে জানাতে হবে। বন্ধুর সাথে অন্ততঃ ০৬ মাস যাবৎ যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। তবে লগবইয়ে শুধুমাত্র তাদের নাম, ঠিকানা, ছবি ও অটোগ্রাফ (সম্ভব হলে) বন্ধুত্ব স্থাপণের তারিখ এবং বিদেশী বন্ধু হলে সে দেশের রাজধানী, মুদ্রা, ইউএস ডলারের প্রেক্ষিতে মুদ্রার মান, প্রধান বিমান বন্দর, অবস্থান ইত্যাদি মৌলিক তথ্যাবলি ছক আকারে লিখলেই চলবে। বন্ধুত্ব তৈরি কার্যক্রম বর্তমানে অতি সহজেই বিভিন্ন সামাজিক ওয়েব সাইট যেমন- ফেসবুক, ট্যুইটার, স্কাইপি ইত্যাদির মাধ্যমে করা যায়।

০৮. কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

MS Office (Word, Power Point), E-mail সম্পর্কে জানা।

❒ Microsoft (MS) Word

Microsoft Word is an application software. It's a word processing software which is used to create, edit, view, print and format documents.

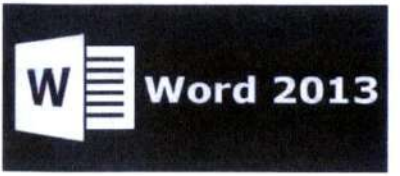

☞ **How to start?**

Start-all programs- MS Office-MS Word

Description of MS Word 2000/XP editing screen:

Title bar, Menu bar, Standard tools bar, Formatting tools bar, Tables and border tools bar, Ruler, Blank Screen, Horizontal and vertical scrollbar, Drawing tools bar, Status bar.

☞ **How to open a new document?**

File-New-New Document

[N.B. Press Ctrl+N to open a new blank document]

☞ **How to save a document file?**

File-save-Selection a name save

[N.B. Press Ctrl+S to save a file]

☞ **How to change Font size?**

Format-Font-(Selection a size)-OK

☞ **How to change Font Color?**

Format -Font- selecting a color-OK

☞ **How to Bold?**

To make a selection of writing highlighted **'Bold'** is used. To bold a section we have to select the whole section and click on the **Bold** 'B' from toolbar. Or we can press Ctrl+B after select the section.

☞ **How to make *Italic*?**

To make a section of writing highlighted *Italic* is used. To do *Italic* a section we have to select the whole section and click on the *Italic 'I'* from toolbar. Or we can press Ctrl+I after select the section.

☞ **How to Underline?**

To make a section of writing highlighted Underline is used. To do underline a section we have to select the whole section and click on the Underline 'U' from toolbar. Or we can press Ctrl+U after select the section.

☞ **Page setup:**

File-Page setup-OK

☞ **Print:**

File-Print Or Ctrl+P

☞ **Print preview:**

File-Print preview Or Ctrl+F2 or Ctrl+Alt+I

❒ Microsoft (MS) Power Point

Microsoft Power Point, usually just called Power Point, is proprietary presentation program developing by Microsoft. It is a part of Microsoft Office Suite.

☞ **How to Start Microsoft Power Point?**

Start-all programs-MS Office-MS Power Point

☞ **How to create a new Power point File?**

File-New Blank presentation [From upper right]

[N.B. Press Ctrl+N to open a new blank presentation]

☞ **How to create a new designed presentation?**

File-New (from designed template)

☞ **How to insert a new slide?**

Insert-new slide

[N.B. Press Ctrl+M to insert a new slide]

☞ **How create an animated slide?**

Slide show-Custom animation-Add effect [From upper right]

☞ **How to view slide(s) show?**

Slide show-View show

[N.B. Press F5 to view the slide show]

❒ E-mail

ই-মেইল হলো ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের সহজ ও দ্রুততম মাধ্যম। যুগের চাহিদার সাথে সাথে চিঠিপত্র সহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে এসেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। অতীতে কবুতর, ডাক-হরকরা, ঘোড়ার ডাক ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা হত। এরপর পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে- ডাক, টেলিগ্রাফ; ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা হয়, হচ্ছে। বর্তমান সময়ে ই-মেইল এর মাধ্যমে চিঠিপত্র সহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ ও গ্রহণ করা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ই-মেইল এ তথ্য আদান-প্রদান করতে হলে একটি ই-মেইল এড্রেস থাকতে হয়। এক্ষেত্রে ISP তথা ই-মেইল প্রোগ্রাম যেমন- yahoo, ymail, gmail, hotmail, rocketmail ইত্যাদিতে বিনামূল্যে নিজস্ব এড্রেস খোলা যায় এবং বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে সেই এড্রেস এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। তাই অনেকে ই-মেইলকে 'আকাশের ঠিকানা' বলে অভিহিত করে থাকেন। যা সত্যি বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য।

যা লক্ষ্যণীয়-

- ওয়ার্ড প্রসেসিং সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা অর্জন করা। প্রয়োজনে তিন/ছয় মাসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হয়ে জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে।
- একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নিজে টাইপ করে প্রিন্ট দিতে পারা এবং বিভিন্ন প্রিন্টার সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন।
- নিজ তথ্যাবলি যেমন- নাম, বাবার নাম, মাতার নাম, রক্তের গ্রুপ, ঠিকানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, বর্তমান অবস্থান, স্কাউটিংয়ে যোগদান, অংশগ্রহণকৃত বিভিন্ন ক্যাম্পের নাম, অর্জনকৃত অ্যাওয়ার্ড সমূহের নাম ও সময়, যা করতে ভাল লাগে, পছন্দের খেলা ইত্যাদি দিয়ে একটি Power Point প্রেজেন্টেশন তৈরি করা এবং সম্ভব হলে ইউনিটের সকলের সামনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- ই-মেইল অ্যাড্রেস নিজে খুলতে পারা এবং ইউনিটের নামে খুলতে পারা (যদি খোলা না থাকে) এবং ফাইল এ্যাটাচ করে মেইল পাঠাতে পারা। ইউনিটের মেইল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে ইউনিটের কাজে আরএসএল এর অনুমতিক্রমে কমপক্ষে তিন বার জেলা অথবা আঞ্চলিক স্কাউটসে যোগাযোগ করা/করতে সাহায্য করা।

০৯. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে নতুন ০৪টি গান জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা।

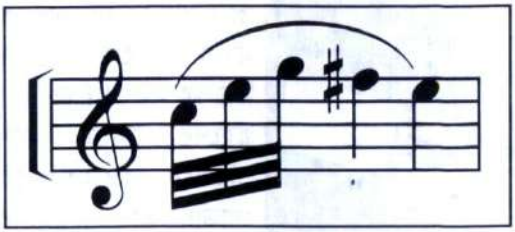

প্রশিক্ষণ স্তরের রোভার স্কাউটদের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক নির্বাচিত গানগুলো হল-

১. ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা...
২. তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে...
৩. টাকডুম টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল...
৪. চল্ চল্ চল্ ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল...
৫. চলে মচ্ মচ্ চলে মচ্ মচ্ সবচেয়ে ভাল পা গাড়ি...
৬. হে খোদা দয়াময় রাহমানু রাহীম...
৭. অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী...

উপরোক্ত গানগুলোর মধ্যে যেকোন ০৪টি।
[বি.দ্র. গানের সিডি বাংলাদেশ স্কাউটসের 'স্কাউট শপ' থেকে সংগ্রহ করা যাবে]

১০. নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন (কমপক্ষে ০১ টি):

বৈদ্যুতিক কাজ, কম্পিউটার (হার্ডওয়ার), আগুন নেভানো, উদ্ধার কর্মী, জনস্বাস্থ্য কর্মী, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশুর যত্ন, নার্সিং, সাংবাদিকতা, ক্রাইম প্রিভেনশন, বিমান শিক্ষানবীশ, শীপস নলেজ, রেলওয়ে পরিচালক।

(বিমান শিক্ষানবীশ- এয়ার রোভার স্কাউট, শীপ নলেজ- নৌ রোভার স্কাউট এবং রেলওয়ে পরিচালক- রেলওয়ে রোভার স্কাউটদের জন্য বাধ্যতামূলক। তবে অন্যান্য রোভার স্কাউটরা অতিরিক্ত হিসাবে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। তেমনিভাবে এয়ার রোভার স্কাউট, নৌ রোভার স্কাউট ও রেলওয়ে রোভার স্কাউটরা অতিরিক্ত হিসেবে অন্যান্য বিষয়গুলির উপর দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।)

বৈদ্যুতিক কাজ:

(১) বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন একক (Unit) সমূহের নাম ও পরিমাপ জানা।

(২) বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামের নাম ও ব্যবহার জানা।

(৩) বিভিন্ন প্রকার বিদ্যুতের পার্থক্য ও ব্যবহার বুঝতে পারা।

(৪) ত্রুটিযুক্ত সুইচ, হোল্ডার, ফিউজ ইত্যাদি মেরামত ও বদলাতে পারা।

(৫) বিদ্যুতায়নের জন্য নকশা প্রণয়ন, বাজেট তৈরি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে ওয়্যারিং করতে পারা।

(৬) গৃহে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে জানা।

(৭) বৈদ্যুতিক মিটার রিডিং জানা ও বিল তৈরি করতে পারা।

(৮) বৈদ্যুতিক কাজে কি কি সতর্কতা গ্রহণ প্রয়োজন তা জানা।

কম্পিউটার হার্ডওয়ার:

Computer Hardware & Trouble shooting

1. Introducing Hardware & Software.
2. Electricity & Power supply.
3. How Hardware & Software work together.
   - Name of Accessories of a PC.
   - Motherboard Architecture & Memory.
   - Secondary Storage device.
   - PC Assembling Software Installation.
   - Trouble shooting & Maintenance a computer.

আগুন নিভানো:

(১) আগুন লাগার কারণসমূহ এবং সতর্কতা সম্পর্কে জানা।

(২) বিভিন্ন প্রকার আগুন নেভানোর উপকরণসমূহ এবং যথাযথ ব্যবহার করতে পারা।

(৩) আগুন লাগা কোন গৃহ থেকে কোন ব্যক্তিকে উদ্ধারের কৌশলসমূহ জানা এবং প্রদর্শন করতে পারা।

(৪) নিকটস্থ দমকল বাহিনীর/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের টেলিফোন নম্বর জানা।

(৫) আগুনের কাছ থেকে জনতার ভীড় সরানো ও আতংক দূর করার কৌশল জানা।

উদ্ধার কাজ:

(১) কোন ব্যক্তিকে পানি থেকে উদ্ধার করার কৌশলসমূহ জানা ও প্রদর্শন করতে পারা।

(২) উদ্ধার কাজে সতর্কতা সম্পর্কে জানা এবং লাইফ লাইন ব্যবহার করতে পারা।

(৩) জলে ডোবা কোন ব্যক্তির প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে পারা।

(৪) কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার কৌশল সম্পর্কে জানা ও প্রদর্শন করতে পারা।

(৫) রোগী বহন ও স্থানান্তরের কৌশলসমূহ জানা ও প্রদর্শন করতে পারা।

(৬) আগুন থেকে কোন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার কৌশলসমূহ প্রদর্শন করতে পারা।

"স্কাউট কর্মী ব্যাজ" অর্জনে যদি কেউ উদ্ধার কর্মী বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে তবে তাকে এখানে এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন নেই।

জনস্বাস্থ্য কর্মী:

(১) নিজ স্বাস্থ্য রক্ষার বিভিন্ন নিয়ম-কানুনসমূহ জানা ও পালন করা।

(২) নিম্নলিখিত যেকোন তিনটি রোগ কিভাবে সংক্রামিত হয় এবং এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা- ডিপথেরিয়া, হাম, জলবসন্ত, যক্ষ্মা, কলেরা, আমাশয়, খোসপাঁচড়া, কৃমি, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি।

(৩) সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বিছানাপত্র, জামা-কাপড় এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র জীবানুমুক্ত করার কৌশলসমূহ জানা ও প্রদর্শন করতে পারা।

(৪) খাবার স্যালাইন তৈরি করতে পারা।

(৫) অগভীর নলকূপ বসানো ও সেনেটারী পায়খানা স্থাপন কৌশল জানা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারা।

(৬) পানীয় জল বিশুদ্ধকরণের পদ্ধতিসমূহ জানা।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ:

(১) বাংলাদেশের সীমানা, আয়তন সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এর সাথে সম্পর্ক রেখে জনসংখ্যার চিত্র উপলব্ধি করতে পারা।

(২) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানা এবং তা থেকে জাতিকে মুক্ত করার উপায়সমূহ নির্ধারণ করতে পারা।

(৩) পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠন (জন্ম নিয়ন্ত্রণ) সম্বন্ধে জানা।

মা ও শিশুর যত্নঃ

(১) সন্তান সম্ভবা ও প্রসূতি মায়ের যত্ন সম্বন্ধে জ্ঞান এবং খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে পারা।

(২) নবাগত শিশুর যত্ন এবং শিশু যে সকল রোগে আক্রান্ত হয় তার নাম জানা এবং প্রতিকারের উপায় জানা।

(৩) পুষ্টি ও খাদ্য উপাদান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান।

(৪) খাদ্যে খাদ্যমান যাতে অক্ষুন্ন থাকে সে সম্বন্ধে জানা।

(৫) মা ও শিশুর যতে যে সকল টিকা দিতে হয় তা জানা।

নার্সিংঃ

(১) সকল প্রকার ইনজেকশন ও স্যালাইন দেয়ার পদ্ধতি জানা ও দিতে পারা।

(২) স্যালাইন দেয়ার কৌশল জানা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারা।

(৩) প্রেসার মাপতে পারা।

(৪) হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস কেন হয়? কিভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা জানা।

(৫) হৃদরোগ ও ডায়বেটিস রোগীর খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে পারা।

(৬) টাইফয়েড, জন্ডিস ইত্যাদির প্রাথমিক জ্ঞান।

সাংবাদিকতাঃ

(১) গণ-সংযোগের বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে জানা।

(২) কোন কার্যক্রমের উপর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তৈরি করতে পারা।

(৩) যেকোন কার্যক্রমের উপর পত্রিকায় প্রকাশ বা প্রচারোপযোগী করে রিপোর্ট তৈরি করতে পারা।

(৪) যেকোন একটি গণসংযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্পর্কে জানা।

(৫) ছাপাখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চিনতে পারা ও তাদের নাম জানা।

(৬) ছাপাখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের পয়েন্ট ও টাইপ চিনতে পারা।

(৭) প্রুফ দেখতে পারা।

(৮) 'ষ্টপ প্রেস' বলতে কি বুঝায় তা জানা।

(৯) দেশী ও বিদেশী সংবাদ সংস্থার নাম জানা (অন্ততঃ ১০ টি)।

ক্রাইম প্রিভেনশনঃ

(১) অপরাধ কি এবং অপরাধের প্রকার কি কি ?

(২) অপরাধ সংঘটনের কারণ ও প্রতিরোধের উপায়সমূহ জানা।

(৩) অপরাধ দমনে জনগণকে সচেতন করার উপায় জানা।

(৪) অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করা।

(৫) খালি হাতে আত্মরক্ষার কৌশল জানা।

(৬) পুলিশ বাহিনীর র‍্যাংক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

(৭) বাংলাদেশ পুলিশ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে জানা।

(৮) নিকটস্থ থানা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ফোন নম্বর জানা।

বিমান শিক্ষানবীশঃ

(১) বিমান উড্ডয়ন সম্পর্কিত তত্ত্বীয় জ্ঞান (Theory & Principal of Flight - Aero & Heli dynamics)।

(২) বিমানের কাঠামো (Air Frame) এবং ইঞ্জিন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।

(৩) বিমান থেকে ব্যবহৃত "অস্ত্র ও গোলাবারুদ" (Weapon & Armament) সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।

(৪) বিমান ও হেলিকপ্টারের পর্যায়ক্রমিক উন্নতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।

(৫) ফিউচার এভিয়েশন (Future Development of Air Craft & Helicopter) সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।

(৬) জোর্তিবিদ্যা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান এবং বিমান চালনায় এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

(৭) যেকোন একটি বিমানের মডেল তৈরি করে তা কমপক্ষে ১০ সেকেন্ড বাতাসে উড্ডয়ন করাতে পারা।

(৮) কোন স্থানে বিমান দূর্ঘটনা ঘটলে নিজের করণীয় সম্পর্কে জানা।

শীপস নলেজঃ

(১) জাহাজের প্রকারভেদ জানা।

(২) যুদ্ধ জাহাজ এবং বাণিজ্যিক জাহাজের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারা।

(৩) নেস্ত জাহাজের বিভিন্ন অংশের এ্যাংকর এর নাম জানা।

(৪) এ্যাংকরের বিভিন্ন অংশের নাম এবং এর সাথে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কে জানা।

(৫) বোটের ব্যবহার ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা।
(৬) বোটে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কে জানা
(৭) Sea Measures, Watches and striking the ships Bell সম্পর্কে জানা।
(৮) দড়ির প্রকারভেদ, দড়ির যত্ন, Blocks I Blocks এর প্রকারভেদ, মাস্তুল ও মাস্তুলের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা।

রেল পরিচালক ঃ

(১) রেল ছাড়ার পূর্বে সাধারণ পরীক্ষা সম্পর্কে জানা।
(২) রেল বগি থেকে যেকোন সময় ট্রেন থামানোর পদ্ধতি জানা।
(৩) মিটার গেজ ও ব্রড গেজের লাইন সম্পর্কে জানা।
(৪) পরিচালকের সাথে ৪০০ কিঃমিঃ ভ্রমণ করা এবং ভ্রমণকালে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
(৫) ডক পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করা।
(৬) অন্তত ০৫ দিন রেল ষ্টেশনে সেবা প্রদান।

১১. ধর্মীয় কার্যাবলী ও মূল্যবোধ ঃ

ক) নিজ নিজ ধর্মে অবশ্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা।

১. নিজ নিজ ধর্মে অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ পালনের জন্য সমস্ত নিয়ম-নীতি সম্পর্কে পরিমিত জ্ঞানার্জন, চর্চা ও অপরকে উদ্বুদ্ধ করা।

ইসলাম ধর্মীয় বিষয় ঃ

ঈমান, বিভিন্ন ওয়াক্তের নামাজের নিয়ত, রোজা, হজ্জ, যাকাত এবং কোরবানী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে স্বীয় জীবনে চর্চা করা এবং অপরকে উদ্বুদ্ধ করা।

হিন্দু ধর্মীয় বিষয় ঃ

পূজা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে হিন্দু ধর্মালম্বি লোকেরা মূর্তি তৈরি করে তাদের ধর্মীয় কাজ করে থাকে। হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে দূর্গা পূজাসহ সাধারণ পূজার বিধি এবং তা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয় ঃ

আর্য অষ্টাংগিক মার্গ বা অরিয়ো অঠঙ্কিকো মগ্গো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

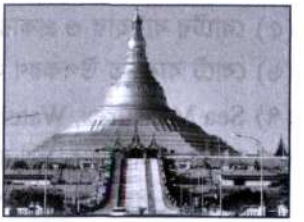

খ্রিষ্টান ধর্মীয় বিষয় ঃ

ক) মুক্তির ইতিহাস, ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা, ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ, পবিত্র আত্মার উপস্থিতি, মন্ডলীর পার্বনসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন।

২. নিজ ধর্মের মৃত ব্যক্তির সৎকার সম্পর্কে পরিমিত জ্ঞান অর্জন।

❐ ইসলাম ধর্ম ঃ

১। মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য তিনখানা কাপড় কাফন হিসেবে দেয়া সুন্নত; যথা- ইযার, কোর্তা এবং চাদর। স্ত্রী লোকের পাঁচখানা কাপড় দেয়া সুন্নত; যথা, কোর্তা, ইযার, ছেরবন্দ, চাদর এবং সীনাবন্দ। ইযার মাথা হতে পা পর্যন্ত, চাদর উহা হতে হাত নেক বড় এবং কোর্তা গলা হতে পা পর্যন্ত; কিন্তু কোর্তার অস্তিন হবে না। শুধু মাঝখান দিয়ে কিছু ফেড়ে মাথা ঢুঁকিয়ে দিতে হবে। ছেরবন্দ ১২ গিরা চওড়া এবং তিন হাত লম্বা এবং সীনাবন্দ চওড়ায় বগলের নীচে হতে রান পর্যন্ত হবে, লম্বায় এতটুকু হতে হবে যেন বাঁধা যায়।

২। মাসআলা ঃ স্ত্রী লোকের কাফন যদি পাঁচখানা না দিয়ে ইযার, চাঁদর এবং ছেরবন্দ মাত্র এ তিনখানা কাপড় দেয়, তবে তাও জায়েয আছে। তিন কাপড়ের চেয়ে কম দেয়া মাকরুহ। আর অক্ষম হলে তিন কাপড়ের চেয়ে কম দেয়া জায়েয আছে।

৩। মাসআলা ঃ সীনাবন্দ যদি ছাতি হতে নাভি পর্যন্ত দেয়, তবে তাও জায়েয আছে, কিন্তু রান (হাঁটুর উপর) পর্যন্ত দেয়া উত্তম।

৪। মাসআলা ঃ কাফন পরাবার পূর্বে তাতে তিনবার কিংবা পাঁচবার লোবান বা আগর বাতির ধুনি দেয়া উচিত।

৫। মাসআলা ঃ কাফন পড়াবার নিয়ম ঃ খাটের উপর সর্ব প্রথমে নীচে চাদর, তার

উপর ইযার, তার উপর কোর্তার নীচের অংশ বিছাতে হবে, উপরের অংশ গুছিয়ে মাথার কাছে রেখে দিতে হবে। তারপর মৃতকে গোসলের পানি মুছিয়ে একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে আস্তে এনে কাফনের উপর চিৎ করে শোয়াবে এবং কোর্তা পরিধান করিয়ে দিবে। তারপর যদি পুরুষ হয়, তবে শুধু ইযার এবং চাঁদর লেপটায়ে দিবে। আর যদি মেয়ে লোক হয়, তবে তার চুলগুলো দু ভাগে ভাগ করে ডানে বামে কোর্তার উপর দিয়ে বুকের উপর রেখে দিতে হবে এবং ছেরবন্দ দ্বারা মাথা ঢেকে ঐ দু ভাগ চুলের উপর দুই দিকে ছেরবন্দের কাপড়খানা রেখে দিবে। এ কাপড়ে বাঁধা বা পেঁচানো যাবে না। তারপর ইযারের বাম পার্শ্বে (মোর্দার বাম পার্শ্বে) আগে উঠাবে এবং ডান পার্শ্ব পরে উঠিয়ে তার উপর রাখবে, তারপর সীনাবন্দ দিয়ে সীনা পেঁচিয়ে দিতে হবে, তারপর চাঁদর পেঁচিয়ে দিতে হবে- বাম পার্শ্ব নীচে এবং ডান পাশ্ব উপরে থাকবে। তারপর একটা সুতা দিয়ে কাফনের পায়ের দিকে একটা একটা সুতা দ্বারা মাথার দিকে বেঁধে দিতে হবে এবং কোন কিছু দিয়ে কোমরের দিকে একবাঁধ দিলে ভাল হয়- যাতে কবরস্থানে নিয়ে যাবার সময় খুলে না যায়- কবরে রেখে এসব বাঁধন খুলে দিতে হবে।

৬। মাসআলা ঃ সীনাবন্দ যদি ছেরবন্দের পর ইযার পেঁচাবার আগে বেঁধে দেয় তাও জায়েয আছে। কোর্তার উপর বাসব কাফনের উপর দেয়া জায়েয আছে।

৭। মাসআলা ঃ মৃত মেয়ে লোক হলে মেয়ে মহলে এ পর্যন্তই কাজ হবে। তারপর পুরুষদেরকে ডেকে তাদের নিকট অর্পন করে দিবে তারা জানাযা পড়ে দাফন করবে।

৮। মাসআলা ঃ যদি মেয়ে লোকেরাই জানাযায় নামায পড়িয়ে দেয়, তবুও জায়েয হবে। পুরুষের অভাবে মেয়ে লোকেরাই জানাযায় নামায পড়াবে এবং দাফনও করাবে।

৯। মাসআলা ঃ কাফনের মধ্যে বা কবরের মধ্যে আ'হাদনামা, পীরের শাজরা অথবা অন্য কোন দো'আ কালাম লিখে রাখা বা কাফনের উপর অথবা সীনার উপর কালি বা কার্পূর দিয়ে কোন দো'আ বা কালেমা-কালাম লিখে দেয়া জায়েয নেই। অবশ্য খালি আঙ্গুলে কালেমা বা আল্লাহর নাম লিখে দেয়া বা কা'বা শরীফের গেলাপ ইত্যাদি বরকতের জন্য সাথে দেয়া জায়েয আছে।

১০। মাসআলা ঃ ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই যে শিশুর মৃত্যু হয়েছে তার নাম রাখবে, উপরোক্ত নিয়মে গোসল, কাফন এবং জানাযার নামায পড়িয়ে দাফন করা।

১১। মাসআলা ঃ যে শিশু মৃত অবস্থায় প্রসব হয়েছে, প্রসবকালে জীবিত হওয়ার কোন আলামত পাওয়া যায় নাই, তাকেও গোসল দিতে হবে এবং তার নামও রাখতে হবে। কিন্তু নিয়ম মত কাফন দেয়া ও জানাযা পড়ার প্রয়োজন নাই। একখানা কাপড় লেপ্টায়ে কবরে মাটি দিয়ে রাখলেই চলবে।

শিশু সন্তানের দাফন-কাফন :

১২। মাসআলাঃ অকালে গর্ভপাত হলে যদি সন্তানের হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রকাশ না পায়, তবে গোসল ও নিয়মিত কাফন দেয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু একখানা কাপড়ে পেঁচিয়ে একটি গর্ত খুঁড়ে মাটির নীচে পুঁতে রাখবে। আর যদি হাত, পা, নাক ইত্যাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, তবে এক মৃত বাচ্চা মনে করতে হবে এবং নাম রাখতে হবে, গোসল দিতে হবে, কিন্তু জানাযার নামায বা নিয়মিত কাফন দেয়ানোর প্রয়োজন নেই, শুধু একখানা কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে রাখতে হবে।

১৩। মাসআলা ঃ যে সময় সন্তানের মাথা বের হয়েছে, সে সময় জীবিত থাকার আলামত পাওয়া গেলেও যদি সাথে সাথে মরে যায়, তবে ঐ বাচ্চাকে মৃত মনে করতে হবে। অবশ্য যদি বুক পর্যন্ত বের হয়ে থাকে, বা উল্টা বের হয়ে থাকে, বা উল্টা বের হলে নাভি পর্যন্ত বের হয়ে থাকে, তবে একে জীবিত হয়েছে মনে করতে হবে।

১৪। মাসআলাঃ মেয়ে যদি ছোট হয় কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার কাছাকাছি হয়, তবে তাকে বয়স্কা মহিলার নিয়মে পাঁচ কাফন দেয়া সুন্নাত, তিন কাপড়ে দিলেও চলবে। বয়স্কা এবং কুমারী ও ছোট মেয়েদের জন্য একই হুকুম। কিন্তু বয়স্কাদের জন্য এটা তাকীদী হুকুম, যদি কিছু ছোট হয় তবে তাকেও ঐ নিয়মেই কাফন দিতে হবে।

১৫। মাসআলাঃ যদি অত্যন্ত ছোট মেয়ে হয় যে, এখনও প্রাপ্ত বয়স্কা হতে অনেক দেরী, তার জন্যও মহিলাদের নিয়মে পাঁচ কাপড়ে কাফন দিবে। যদি শুধু ইযার ও চাদর এই দুই কাপড়ে কাফন দেয়, তাও জায়েয আছে।

১৬। মাসআলা ঃ ছোট ছেলেকে মেয়ে লোকেরাও উপরোক্ত নিয়মে গোসল দিতে পারে এবং কাফন পড়াতে পারে। অবশ্য কাপড় পুরুষের নিয়মে দিতে হবে অর্থাৎ এক চাঁদর, এক ইযার ও এক কোর্তা।

১৭। মাসাআলাঃ পুরুষের কাফনে যদি শুধু ইয়ার ও চাদর এ দুই খানা কাপড় দেয়, তাও জায়েয আছে, দুই খানার চেয়ে কম দেয়া মাকরূপ; অক্ষম হলে দুই খানার চেয়ে কমও মাকরূহ নয়।

১৮। মাসাআলাঃ জানাযার উপর যে চাদর ঢাকার জন্য দেয়া হয়, তা কাফনের মধ্যে শামিল নয়।

১৯। মাসাআলাঃ যে শহরে মৃত্যু হয়, সেখানেই কাফন-দাফন করা ভাল অন্যত্র নিয়ে যাওয়া ভাল নয়। অবশ্য প্রয়োজন হলে দু এক মাইল দূরে নেওয়ায় দোষ নাই।

❐ হিন্দু ধর্ম :

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রমতে একটি বিশেষ আচার হচ্ছে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা জন্ম এবং মৃত্যু এই দুইটি আচারকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করে পালন করে। আমরা এখন সেই আচারকে নিয়ে জানব সেটা হল মৃত্যু। যদি কোন পিতা মারা যায় তখন তার জোষ্ঠ পুত্র সেই আদ্র শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করে। সনাতন মতে কেউ দাহ করে, কেউ আবার মাটি দেয়। আমরা দাহ কার্য নিয়ে কথা বলব। যখন পিতা মারা যায় তখন লাশকে খাঁটিয়ায় নিয়ে শ্বশ্মানে যাওয়া হয়। ঢোল আর করতাল বাজায়ে 'স্বর্গে বল হরি, হরি বল, বল হরি, হরি বল' এই ধ্বনি উচ্চারণ করে তারপর লাশকে নিয়ে ছেলে শ্বশ্মানে গিয়ে তাকে নতুন ধুতি পড়িয়ে স্নান করাতে হয় এবং তার সকল সন্তানরা স্নান করে। তারপর শ্বশ্মানের উদ্দেশ্যে সেই শ্বশ্মান বন্ধুরা যে খড়ি পাট খড়ি নিয়ে যায় সেগুলো দিয়ে চিতা সাজানো হয়। সেই চিতাতে উপর করে রেখে মৃত ব্যক্তিকে তুলে দিয়ে তার পরনের কাপড় খুলে ফেলতে হয়। তারপর তার মুখ অগ্নি করার জন্য বড় ছেলেকে সামনে নিয়ে তার হাতে আগুন জ্বালানো পাটখড়ি তুলে দিতে হয়। সেই পুত্র সাতপাক ঘুরে পিতার মুখে আগুন দেয়। শ্বশ্মান বন্ধুরা ছেলেদের আবার স্নান করায় এবং জ্যৈষ্ঠ পুত্রের হাতে অগ্নি নিয়ে গঙ্গায় পিত্ত দান করে সেখানে উপস্থিত সকল মানুষের নাম লিখে নেয়। এদের মিষ্টি মুখ করায়। এবার মাটির কলস ভর্তি পানি নিয়ে হাড়ি ফুটো করে এরপর তারা বাড়ি ফিরে আসে। পরের দিনে পিতার উদ্দেশ্যে ছেলেরা মা সকলেই ভবিষ্যৎ করে। এবং ছেলেরা শুধু মার্কিন কাপড়ের একটি মাত্র ধুতি দিয়ে গা জরিয়ে থাকে। সেই কাপড় ভিজিয়ে স্নান করে এবং তা দিয়েই ১২/১৫ দিন পালন করে। এই অবস্থায় তারা নিরামিষ খায়। শ্বশ্মান বন্ধুদের ক্যাটরা খাওয়ানোর

জন্য নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। খাওয়ার তালিকায় থাকে শুধু দই, চিড়া, গুড় আর মিষ্টি ব্রীয় আদা দিয়ে লবণ খেতে হয়। হিন্দু শ্বশ্মান বন্ধুরা যারা লাশের সঙ্গে যায় তারা বাড়ীতে স্নান করে ফিরে তারা অসুত কাটানোর জন্য আগুনে হাত তাপে এবং শিল আগুনে রেখে তা হাত দিয়ে ধরে বুকের দুই ধারে এবং তারপর মাথায় ঠেকাতে হয়। তারপর ভেজা কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে থাকতে হয়। উল্লেখিত যে বাড়ীতে এই লাশ থাকে সেই বাড়ীতে তাকে দেখতে যত লোক বাড়ীর মধ্যে যায় তারা ফিরার পরে স্নান করে। ১১ দিন মৃতের বাড়ীতে কেউ যায় না, অশুদ্ধ বলে। খাবারের তালিকায় থাকে আতপ চাল, আলু, ফলমূল ইত্যাদি। কোন রকম আমিষ জাতীয় খাদ্য আহার করা যায় না। ছেলেরা এই সময় চোতা ধারণ করে সঙ্গে কশাসন এবং জলোহা নিয়ে থাকে অদিন পুর। খাবার রান্না করে জ্যেষ্ঠ পুত্র তাও আবার একটি মাটির পাতিলে। একবারে যতটুকু পুচফাটি ভাত সেই হাড়ী থেকে পড়ে সেই ভাতটুক আহার করে ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়। যার ভাগে যতটুকু পড়ে তার এতটুকু খাদ্য খেতে হয়। শুধু দুপুরে ভাত খেতে হয় অন্য কোন সময় নয়। অন্য সময় ফলমূল খেতে হয়। এইভাবে একদিন, দুইদিন করে ১৩/১৫দিন কাটাতে হয়। ১১তম দিন তাদের (ছেলেদের) সেই সাথে নাতিদের মাথায় ন্যারা হাতের নখ কাটতে হয় একে বলে 'কোমামা'। এর পরের দিন হয় শ্রাদ্ধ। এইদিন পুরোহিত দিয়ে বাড়ীতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে হয়। তারপরের দিন সমাজ খাওয়াতে হয়। এতে কেউ দেয় মাছ-ভাত, কেউ আবার মহাপ্রভুর ভোগ দেয়। যার মধ্যে যতখানি সামর্থ্য সে সেই রকম কাজ করে। এইভাবে সকল কর্ম সু-সম্পন্ন করে।

❐ বৌদ্ধ ধর্ম :

অন্যান্য ধর্মের মত বৌদ্ধ ধর্ম একটি সু-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। মহামতি গৌতম বুদ্ধ হল বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা গৌতম বুদ্ধের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই উপাসনা করে। প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল ত্রিপিটক। মানুষ জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করবে এটাই মহাসত্য ও প্রকৃত নিয়ম। তবে জাতি ও ধর্মভেদে এর সৎকার পদ্ধতি একটু ব্যতিক্রম। নিম্নে বৌদ্ধধর্মের সৎকার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। যেকোন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির মৃত্যুর পর মরদেহটি একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরের ভিতর একটি আসন প্রস্তুত করা থাকে। উক্ত আসনে মরদেহটি বসানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং চারদিকে কাঠ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। শেষে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

❒ খ্রিষ্টান ধর্ম :

১ম অংশ :

১। মৃত ব্যক্তি ও শোকার্ত পরিবারের জন্য প্রার্থনা, মৃত-ব্যক্তিকে ধোঁয়ানোর পর কফিনে ভরে মৃতদেহ সমাধির পূর্বে রাখা হবে। (গীর্জাঘরে বা বাড়িতে) সে স্থানটুকু ফুল দিয়ে সাজিয়ে, মোমবাতি, ধুপ দিয়ে, আগরবাতি জ্বালিয়ে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশিরা মিলে নিচের প্রার্থনা গান, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি করতে পারে। এ ধরণের উপাসনা করলে মৃত আত্মার মঙ্গল হয় ও শোকার্তরা সান্ত্বনা পায়।

১। এবার্চি বা ২টি ধর্ম্মীয় গান

২। পরিচালক বলবেন,

মানুষ মরতে চায় না, কিন্তু যে জন্মেছে তাকে একদিন মরতে হবে। যখন আমরা কাউকে মরতে দেখি তখন মৃত্যু আমাদের কাছে এক বিভীষিকা ও নিরাশার কারণ হয়ে পরে। কিন্তু খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর কাছে মৃত্যু কোন শোক নয়। নতুন জীবনের আরম্ভ মাত্র। মৃত্যু এ জগৎ থেকে অনন্ত জীবনে যাবার দরজা। কারণ খ্রীষ্ট বলেছেন 'আমি সত্য বলছি, যাথাথারা মেনে চলবে তারা কোনদিন মরবে না।' যোহন ৮ঃ৫১

শাস্ত্র বাণী

যীশু বলেন মৃত্যুলোক থেকে মৃত্যুকে ডেকে তুলে আমিই দিই তাদের নতুন পুণঃজীবন। আমাকে যে কেউ বিশ্বাস করে সে অন্য সকলের মত মরলেও আবার জীবিত হবে। আমাকে যে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে, সে কখনও মরবে না। পবিত্র বাইবেলের, যোহন ১১ঃ২৫,২৬ পদ ।

আমি জানি আমার মুক্তিবার্তা জীবন্ত। আমার শরীর নষ্ট হলে, শরীরের মাংস না থাকিলেও আমি ঈশ্বরকে দেখব। তাঁকে আমার পক্ষে দেখবে। -ইয়োব ১ঃ২১ পদ

হে সদা প্রভু, আমি যৌবনকালে পাপ ও মন্দ কাজ করেছি তুমি নিজ গুণে দয়া করে সেগুলি মনে রেখো না। -গীতঃ ২৫ঃ৭ পদ ।

যে ঈশ্বর চিরকাল আছেন, তাঁর রাজ্যে তুমি থাকবে, তোমাকে তিনি হাতে ধরে রাখবেন। দ্বি ঃ বিবরণ-৩৩ঃ২৭ পদ

আমি নিশ্চিত যে, কি মৃত্যু, কি জীবন এমনকি নরকের সমস্ত শাস্তি কোন কিছুই আমাকে ঈশ্বরের অসীম ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেনা, যে ভালবাসা খ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়ে দেখিয়েছেন। -রোমীয় ৮ঃ৩৮,৩৯ পদ।

তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক। ঈশ্বরের উপর যেমন তোমাদের বিশ্বাস আছে, তেমনি এখন আমার উপরেও নির্ভর কর। স্বর্গে আমার পিতার বাড়িতে থাকার অনেক জায়গা আছে। -যোহন ১৪ঃ১,২ পদ

নীরবতা

৩। পরিচালক বলবেন ,

হে মৃত আত্মা, তোমার জন্য যিনি প্রাণ দিছেন সেই যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে গ্রহণ করুন, স্বর্গেও দূতেরা তোমাকে স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাক ।

সকলেই বলবেন,

হে স্বর্গের সাধু-সাধ্বীগণ ও পবিত্র দূতবৃন্দ, তোমাকে যারা প্রতিনিয়ত প্রভু পরমেশ্বরের স্তুতি-আরাধনা কর, এই ব্যক্তিকে সেই স্বর্গীয় আরাধনায় সংযুক্তকর ।

৪। ধর্মীয় গান,

আমার জুরালো গ্রাণ যীশুর পায়, অথবা

যে দিন তোমার হইবে আঁধার, অথবা

যে কোন উপযুক্ত গান

৫। পরিচালক বলবেন,

হে চির মঙ্গলময় প্রভু- তোমার এই দাস/দাসীকে কঠোর বিচার ও দন্ড থেকে মুক্তি দাও। তোমার কাছে পূর্ণ মা না পেলে সে পবিত্র হতে পারবে না। এই পৃথিবীতে দুর্বলতাবশতঃ সে যে সকল পাপ করেছে, তোমার অসীম দয়াতে তা মাফ করে নাও, আর তাকে তোমার পদতলে স্থান দাও। তোমার ক্রুশীয় মৃতগুণে আমাদের এই প্রার্থনা গ্রহণ কর। আমেন।

হে জগতের ত্রাণকর্তা, তোমার ক্রুশ ও অমূল্য রক্তপাত দ্বারা তুমি আমাদের উদ্ধার করেছ। হে প্রভু সকাতরে প্রার্থনা করি এই মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সাহায্য কর । আমিন ।

৬। শাস্ত্র পাঠ-

আসলে আমরা কেউ নিজের জন্য বেঁচে থাকি না, নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি বাঁচি প্রভুর জন্যই বাঁচি, আর যদি মরি, তাহলে প্রভুর জন্যই মরি। সুতরাং বাঁচি বা মরি, যে ভাবেই থাকি না কেন, আমরা প্রভুরই। কারণ, খ্রীষ্ট এই জন্যই মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং আবার বেঁচে উঠেছিলেন, যাতে তিনি মৃত ও জীবিত সকলেরই প্রভু হতে পারেন। মনে রেখো, আমাদের সকলকেই একদিন পরমেশ্বরের বিচার আসনের সামনে দাঁড়াতে হবে। -রোমীয়ঃ-১৪ঃ৭,১০

বুদ্ধগণ, আমি একথাই বলতে চাই যে, রক্তমাংসের দেহে ঐশরাজ্যের আধিকারী হওয়া যায় না। নশ্বর বস্ত্র আবনশ্বরতা লাভ করতে পারেন। আমি একটি নির্গত

বিস্ময় তোমাদের বলছি, আমাদের সকলেরই মৃত্যু হবে না কিন্তু সকলেই হব রূপান্তরিত। মূহুর্তে, চোখের পলকে, শেষ তীরধ্বান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ঘটবে। ধ্বনিত হবে, মৃতেরা আবিনশ্বর হয়ে উজ্জীবিত হবে এবং আমরা হব রূপান্তরিত। কারণ এই নশ্বর সত্ত্বাকে আবিনশ্বরতা ধারণ করতে হবে, এই মরদেহকে অমরতায় মঞ্জিত হতে পারে। এই নশ্বর সত্ত্বা যখন আবিনশ্বরতা ধারণ করবে, এই মরদেহ যখন অমরতায় মঞ্জিত হবে, তখনই পূর্ণ শাস্ত্রের এই বাণী জয়লাভ হল সম্পূর্ণ মৃত্যু পরাভূত হল। মৃত্যু তোমার জয় হল কোথায়? মৃত্যুর হল পাপ এবং পাপকে শক্তি যোগাই নৈতিক বিধান। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ, তিনিই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে জয়ী করেন। অতএব প্রিয় বন্ধুগণ তোমার প্রতিজ্ঞ হও, অবিচল থাক, প্রভুর কাজে সর্বদা তৎপর হও। তোমরা জান যে প্রভুর জন্য তোমাদের পরিশ্রম কখনই বৃথা হবে না। -১ম করিজীয় ১৫ঃ৫০-৫৮
অথবা পবিত্র পাঠ। -২য় তীমথিয় ২ঃ৮-১২ যোহন ১৪ঃ১-৬ পদ
(প্রয়োজন শাস্ত্রবাক্য বিষয়ে দু-চার কথা বলা যেতে পারে)

মিনতি প্রার্থনা

৭। পরিচালক বলবেন,

প্রিয় ভাই বোনেরা, এস/আসুন আমাদের প্রিয় ভাই/বোনদের জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করি, যিনি বলেছিলেন আমি পুনরুত্থান ও জীবন, যে আমাকে বিশ্বাস করে সে মরলেও বেঁচে থাকবে, আর যে বেঁচে আছেও আমাকে বিশ্বাস করে সে কখনই মরবে না। প্রভু, তুমি ল্যাসারের মৃত্যুতে কেঁদেছিলে, দয়া করে আমাদের চোখের জল মুছে দাও।
সকলে- মিনতি করি, আমাদের প্রার্থনা শোন। তুমি মৃত্যুকে জীবন দিয়েছ দয়া করে আমাদের এই ভাইকে/বোনকে অনন্ত জীবন দাও ।
সকলে- মিনতি করি, আমাদের প্রার্থনা শোন ।
প্রভু, তুমি অনুতপ্ত দস্যুকে স্বর্গে যাবার অঙ্গীকার করেছিলেন। দয়া করে আমাদের এই ভাই/বোনকে স্বর্গে নিয়ে যাও।
সকলে- মিনতি করি, আমাদের প্রার্থনা শুনি। আমাদের এই ভাই/বোনকে ব্যপ্তিস্মের পবিত্র জল দিয়ে শুদ্ধ করেছি, দয়া করে তাকে সাধু ও সাদ্ধীদের সহভাগিতার স্থান দাও।
সকলে- মিনতি করি, আমাদের প্রার্থনা শোন। তোমার পবিত্র শরীর ও রক্তে আমাদের এই ভাই/বোনকে তৃপ্ত করেছিলে; এখন দয়া করে তাকে স্বর্গের ভোজসভায় অংশী কর ।

সকলে- মিনতি করি, আমাদের প্রার্থনা শোন। আমরা এই ভাই/বোনকে হারিয়ে শোক করছি। দয়া করে যেন অনন্ত জীবনের আশায় বিশ্বাস করে আমাদের শোকাকুল মনে সান্ত্বনা লাভ করি।
সকলে- মিনতি করি, আমাদের প্রার্থনা শোন ।

৮। **গান-** অয় আনন্দ ধামে চলরে পথিক মন, অথবা কে যাবে কে যাবে সিয়োবন, অথবা যে কোন উপযুক্ত গান।

৯। আমরা প্রার্থনা করি,
হে করুণাময় ও ক্ষমতাশীল ঈশ্বর, আমাদের প্রার্থনা শোন, তোমার এই দাস/দাসীকে দয়া কর। এই সংসার থেকে তুমি তাকে ডেকে নিয়েছ, শয়তানের হাত থেকে তাকে রক্ষা কর। তোমার স্বর্গ দেবতা তাকে স্বর্গ রাজ্যে নিয়ে যাক। তোমার আনন্দ রাজ্যে তাকে স্থান দাও। আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পূর্ণবলে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমেন।

(২) মৃতকে সমাধিদানের প্রার্থনা
বা বয়স্ক ব্যক্তি মৃতদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাবার সময় গান ও দায়য়ের গীত গান করা যেতে পারে
১০। গান-
১১। গীতসংহিতা ২৩ আথবা ১৩০
কবরস্থানে উপস্থিত হবার পর পরিচালক বলবেন,
খ্রীষ্ট এ জন্যেই মৃত্যুবরণ করলেন পুনরুত্থিত হলেন যেন জীবনে বা মরণে সকল অবস্থায় তিনি আমাদের প্রভু হয়ে থাকেন। -রোমীয় ১৪ঃ৯
তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক। ঈশ্বরের উপর যেমন তোমাদের বিশ্বাস আছে, তেমনি এখন আমার উপরেও নির্ভর কর। স্বর্গে আমার পিতার বাড়িতে থাকার আনেক জায়গা আছে। -মোহন ১৪ঃ১২
কবর আশীর্বাদ

১৩। পরিচালক বলবেন,
আসুন, আমরা প্রার্থনা করি।
হে ঈশ্বর, তোমার দয়াতেই পরলোকগত ভক্তদের আত্মা চির শান্তি লাভ করে। দয়া করে এই কবরে আশীর্বাদ কর এবং তোমার স্বর্গীয় দূতদের এই কবরের রক্ষক

করে পাঠাও। যার মৃতদেহ এখানে কবর দেয়া হবে তার আত্মাকে সকল পাপ থেকে মুক্তি দাও। সে যেন সাধু সাধ্বীগণের সঙ্গে চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করে। মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের নামে এই প্রার্থনা শোন। আমেন।

যখন মৃতদেহ কবরে রাখার আয়োজন চলবে তখন পরিচালক নীচের কথাগুলো পড়বেন-

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখপূর্ণ, সে ফুলের মত ফোটে আর ঝরে পড়ে। সে ছায়ার মত অস্থির, কখনও এক অবস্থায় স্থির থাকে না। আমরা বেঁচে থেকেও মরণের মধ্যেই আছি। এ ন্যায্য যে প্রভু তুমি আমাদের পাপ দেখে অসন্তুষ্ট হও, কিন্তু তোমা ছাড়া কার কাছে আমরা সাহায্য চাইব? হে পরম পবিত্র ঈশ্বর হে দয়াময় ত্রাণকর্তা, অনন্ত মৃত্যু ভয়ানক মাতনায় আমাদের ফেলে দিওনা। হে প্রভু আমাদের অন্তরের সমস্তগুপ্ত বিষয় তুমি জান, আমাদের প্রার্থনা তুচ্ছ করো না। হে পরম শক্তিমান ঈশ্বর পবিত্র দয়াময় ত্রাণকর্তা, আমাদের ক্ষমা কর। হে উত্তম বিচারক, দয়া কর, শেষ সময়ের মরণ যাতনায় যেন তোমার কাছ থেকে দূরে সরে না থাকি।

যীশু বলেন পিতা আমাকে যা কিছু দেন সে সমস্তই আমার কাছে আসবে, আর যে আমার কাছে আসবে তাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলে দেবে না। আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তার ইচ্ছা এই, তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তার কিছুই যেন না হারায় বরং শেষ দিনে উঠায়।

মৃতদেহের উপর মাটি নিক্ষেপের সময় প্রার্থনা

১৪। পরিচালক বলবেন,

হে পরম দয়াময় পিতা, আমাদের এই পরলোক গত ভাই/বোন এর আত্মাকে তোমার মঙ্গলময় হাতে আর তাঁর শরীরকে কবরে দিই। মাটিতে মাটি, ভস্মে ভস্মা ও ধুলায় ধুলা মিশে থাক, আমাদের এই দচ্চ আশা আছে যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিনি তার মহাশক্তিতে সবকিছু করতে পারেন, তিনি তাঁর এই সন্তানকে পুনঃরুত্থিত করে, তাঁর গৌরবময় দেহের সমরূপ করে নেবেন। আমেন।

দেহকে পোড়াতে হলে পরিচালক বলবেনঃ

হে পরম দয়াময় পিতা, আমাদের এই পরলোক গত ভাইয়ের/বোনের আত্মাকে তোমার মঙ্গলময়, হাতে সমর্পণ করি, আর তাঁর শরীরকে আগুনে সমর্পণ; এই আশাতে যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিনি তাঁর মহাশক্তিতে সবকিছু করতে পারেন তিনি এই ব্যক্তিকে পূনঃরুত্থিত করে তাঁর গৌরবময় দেহের মত রূপদান করবেন। আমেন।

২য় খন্ড

দেহ পোড়াবার পরে ভণ দেবার সময় পরিচালক নীচের প্রার্থনা করতে পারেনঃ

হে পরম দয়াময় পিতা আমাদের এই পরলোকগত ভাই/বোন এর আত্মাকে তোমার মঙ্গলময় হাতে সমপর্ন করি, আর তার দেহভস্ম কবরে রাখি, এই আশাতে যে, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যিনি তাঁর মহাশক্তিতে সব কিছু করতে পারেন তিনি এই ব্যক্তিকে পুনরুত্থিত করে তাঁর গৌরবময় দেহের মত রূপদান করবেন্। আমেন।

বন্যার সময় বা জলযাত্রায় মৃতদেহ হলে রাখতে হলে পরিচালক নীচের প্রার্থনা করবেনঃ

আমার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মঙ্গলময় হাতে আমাদের এই পরলোকগত ভাইয়ের/বোনের আত্মাকে এবং পুনরুত্থান প্রভু যীশু যে অনন্ত জীবন দান করবেন সেই আশায় একান্ত বিশ্বাসে, তার দেহকে জলে সমর্পণ করি। জগতের বিচারের জন্যে যখন প্রভু, গৌরবময় রাজার বেশে আসবেন তখন জলরাশির মধ্যে সে সকল মৃতলোক আছে তারা উঠে আসবে, তাদের দেহের রূপ বদলে গিয়ে প্রভুর গৌরবময় দেহের মত হবে, সে শক্তিতেই প্রভু সব কিছু নিজের বশে আনতে পারেন সেই শক্তিতেই তা করবেন। আমেন।

হে প্রভু দয়া কর
হে খ্রীষ্ট দয়া কর
হে প্রভু দয়া কর

হে আমাদের স্বর্গ স্থপিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মানা হোক তোমার রাজ্য আসুক তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে ও তেমনি সিদ্ধ হোক। আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও, আর আমাদের সকল অপরাধ মাফ কর, আমরাও যেমন আমাদের অপরাধীদের মাফ করি। আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না, কিন্তু মন্দ হতে রক্ষা কর। আমিন।

১৬। পরে নীচের প্রার্থনাগুলি করা যেতে পারে। হে দয়ালু পিতা- তোমার যে সন্তানকে আমাদের মধ্যে থেকে নতুন জীবনে ডেকে নিয়েছ, তাকে তুমি তোমার আনন্দ রাজ্যে স্থান দাও ও চির শান্তিতে রাখ। আমেন।

হে করুণাময় পিতা মৃত ব্যক্তির বাড়ীর শোকার্ত লোকজন, তাঁর আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী যারা তার অভাব অনুভাব করছে, তাদের সকলকে তুমি স্পর্শ কর ও তাদের মনে সান্ত্বনা দান কর। আমেন।

হে প্রেমময় পিতা আমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত ও আপরিচিত জন যাদের তুমি এর আগে তোমার কাছে তুলে নিয়েছ তাদেরকে ও তোমার আনন্দ রাজ্যের অধিকারী কর। আমিন।

১৭। হে করুণাময় পিতা, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে জাগতিক ভোগ বিলাসে মত্ত থেকে আমরা তোমাকে ভুলে যাই। জীবনের সকল খেলা শেষ হলে তোমার সামনে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তুমি আমাদের চেতনা দাও যেন এই মুহূর্ত থেকে আমরা নিজেদের নতুন সাজে সাজাতে শুরু করি ও জীবনে শেষ দিনে তোমার আনন্দ রাজ্যের অধিকারী হতে পারি, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে। আমেন।
কবরে ক্রুশ চিহ্ন দিয়ে পরিচালক বলতে পারেন,
হে মৃত আত্মা, স্বর্গীয় দূতবন্দ তোমাকে গ্রহণ করুণ এবং লাসারের পুণ্যত্মার সঙ্গে পিতা আব্রাহামের কোলে চির শান্তি লাভ কর। আমেন।
অথবা, বিশ্বাসী মৃতদের আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম করুক। আমেন।
(খ) মৃত শিশুর সমাধি
সমাধি স্থানে যাবার সময় গান/গীতসংহিতা গাওয়া যেতে পারে অথবা পরিচালক নীচের শাস্ত্রবাক্যগুলি পড়তে পারেন।

১। গান, -গীতসংহিতা ২৩
২। শাস্ত্র বাক্য

যীশু বলেন আমিই পুনঃরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে, মরলেও জীবিত হবে। আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না। -যোহন ১১ঃ২৫-২৬।

আমি জানি আমার মুক্তিকর্তা জীবিত, তিনি শেষে ধুলোর উপরে উঠে দাঁড়াবেন। আমার শরীর নষ্ট হলেও এবং শরীরে মাংস না থাকলেও আমি ঈশ্বরকে দেখব। তাঁকে আমার পক্ষে দেখব, কেবল আমারই চোখ তাঁকে দেখবে অন্যে চোখে নয়। -ইয়োব ১৯ঃ২৬-২৬।

আমরা জগতে কিছু সঙ্গে আনিনি আর কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। সদা প্রভু দিয়েছিলেন সদা প্রভুই নিয়েছেন সদা প্রভুর নাম ধন্য হোক। -ইয়োব ১ঃ২১।
তিনি মেষপালকের মত নিজের পাল চরাবেন। বাচ্চা মেষদের দু হাতে তুলে নেবেন কোলে করে বেড়াবেন। -যিশাইয় ৪০ঃ১১।

৩। একদিন মায়েরা তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে এল, যেন যীশু তাদের আর্শীবাদ করেন। তাই দেখে শিষ্যরা বললেন, প্রভুকে এখন বিরক্ত করো না, এই

বলে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। শিষ্যদের এই কাজ দেখে যীশু অসন্তুষ্ট হলেন। তাদের বললেন ছেলে মেয়েরা আমার কাছে আসুক, এদের মত সরল বিশ্বাসীদের জন্যই তো ঈশ্বরের রাজ্য। এদের তাড়িয়ে দিও না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি। যদি কেউ শিশুর মত সরল বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের কাছে না আসে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যের কখনই স্থান পাবে না। তখন তিনি ছেলেমেয়েদের কোলে তুলে নিলেন ও তাদের মাথায় হাত দিয়ে আশির্বাদ করলেন। -মার্ক ১০ঃ১৩-১৫।

যখন মৃতদেহ কবরে দেবার আয়োজন চলবে তখন একটা গান হতে পারে।

৪। গান-

৫। মৃতদেহের উপর মাটি নিক্ষেপের সময় পরিচালক এই বলে প্রার্থনা করবেনঃ

হে পরম দয়াময় পিতা, আমাদের এই পরলোকগত শিশুর আত্মাকে তোমার মঙ্গলময় হাতে সমর্পণ করি, আর তার শরীরকে কবরে দিই, মাটিতে মাটি, ভষেম ভঘম আর ধূলায় ধূলা মিশে যাক, আমাদের এই আশা যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি তার মহাশক্তিতে সব কিছু করতে পারেন, তিনি এই শিশুকে পুনঃরুত্থিত করে তাঁর গৌরবময় দেহের সমরূপ করে নেবেন। আমেন।

৬। তার পর এই বাণী পাঠ করা যেতে পারে

যারা স্বর্গের প্রজা তাদের আর ক্ষিধে হবে না, পিপাসাও পাবে না। তাদের গায়ে দুপুরের কড়া রোদের তাপও লাগবে না। সিংহাসনের সামনে যে মেষ শাবক দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই এদের খেতে দেবেন; এদের পালক হবেন এবং জীবনদায়ী জলের কাছে নিয়ে যাবেন। তাদের চোখের জল ঈশ্বর নিজে মুছে দেবেন।

৭। পরে পরিচালক বলবেন-

যিনি যুগে যুগে রাজত্ব করেন, যার রাজ্য চোখে দেখা না গেলেও কোনদিন শেষ হবে না। যিনি একমাত্র মহাজ্ঞানী ঈশ্বর চিরকাল ধরে তার সম্মান ও গৌরব হোক। আমেন।

অথবা, গান (জীবনে যত পূজা হল না সারা)

৮। পরিচালক- হে প্রভু দয়া কর

সকলে- হে খ্রীষ্ট দয়া কর

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, তোমার রাজ্যে আসুক তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে ও তেমনি সিদ্ধ হোক। আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও। আর আমাদের সকল অপরাধ মাফ কর,

আমরাও যেমন আমাদের অপরাধীদের মাফ করি। আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না কিন্তু মন্দ হতে রক্ষা কর। আমেন।

৯। পরে নীচের প্রার্থনাগুলি পড়া যেতে পারে-

হে দয়াময় পিতা, তোমার পুত্র যীশু বলেছেন যে, শিশুদের দূতেরা স্বর্গে সর্বদা তোমার শ্রীমুখ দেখে থাকে, আশীর্বাদ কর যেন আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে আমাদের এই শিশু তোমার অসীম প্রেমে নিরাপদে আছে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গুণ। আমেন।

হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র প্রিয় পুত্র শিশুদের কোলে নিয়ে আর্শীবাদ করেছিলেন মিনতি করি আমাদের প্রতি দয়া কর, যেন এই শিশুকে তোমার প্রেমময় হাতে রাখতে পারি, আর নিজেরাও স্বর্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হই। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে। আমেন।

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, হে পরম দয়ালু পিতা ও সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বর, তোমার কাছে মিনতি করি, এই শিশুর মৃত্যুতে তাঁর পিতা-মাতা ও অন্যান্য যারা শোকার্ত তাদের প্রতি দয়া কর, তারা যেন তোমার উপর সব দুঃখের ভার ছেড়ে দিয়ে তোমার প্রতি ও সান্ত্বনা লাভ করে। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমেন।

হে মৃত শিশুর আত্মা, স্বর্গের দূতেরা তোমাকে গ্রহণ করুন আর প্রভু যীশুর জন্য যে শিশুরা প্রাণ দিয়েছিলে, তাদের দলে মিশে তুমি চির আনন্দে থাক। আমেন।

খ) নূন্যতম ১টি ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনা কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

-স্ব স্ব ধর্ম অনুসারে আলোচ্য বিষয় সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

১২. স্কাউটিং ও সেবা কার্যক্রম ঃ

ক) কাব/স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ।

প্রতি বছর বিভিন্ন জেলায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাব/স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস ও আঞ্চলিক স্কাউটস কর্তৃক গৃহীত (জুলাই-জুন) প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুসারে আয়োজিত কোর্সে ইউনিটের মাধ্যমে জেলা রোভার ও আঞ্চলিক স্কাউটসকে জানালে একজন রোভার স্কাউট সহজেই বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া কোন জেলা রোভার ইচ্ছে করলে বেসিক কোর্সের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে স্ব উদ্যোগে শুধুমাত্র রোভারদের জন্য বেসিক কোর্সের

আয়োজন করতে পারে। এজন্য সর্বনিম্ন ২২ জন এবং সর্বোচ্চ ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী রোভার স্কাউট নিশ্চিত করে আঞ্চলিক সম্পাদক বরাবর যোগাযোগ করলে, তিনি সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

খ) 'স্কাউট ইনস্ট্রাক্টর ব্যাজ' অর্জন।

কাব স্কাউট/স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সে সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করার পর রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদনক্রমে কোন কাব স্কাউট/স্কাউট ইউনিটে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে অন্ততঃপক্ষে ০৪(চার) মাস নিম্নলিখিত কাজ করা-

১. বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক প্রকাশিত কাব স্কাউট ও স্কাউট সম্পর্কিত বইয়ের উপর পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন।

২. কাব স্কাউট/স্কাউট ইউনিটের জন্য ৩ মাসের একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সাহায্য করা।

৩. কাব স্কাউটদের 'তারা ব্যাজ' অথবা স্কাউটদের 'স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ' বিষয়ে দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ দান।

* সুযোগ থাকলে সদস্য স্তরেও বেসিক কোর্স করা যাবে।

১৩. সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন ঃ

ক) অন্ততঃ ০৩টি (তিন) সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নূন্যতম ৩৬ ঘন্টা নিয়োজিত থাকা (পূর্বেরগুলি ব্যতিত)।

প্রশিক্ষণ স্তরের রোভারদের সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই স্তরে এসে সেবার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে তার চর্চাও তারা চালিয়ে যায়। তবে এতদিন স্বল্প পরিসরের কাজের মাধ্যমে তার চর্চা করা হয়েছে। এখন তাদের বড় ধরণের সেবামূলক কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। এই স্তর সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য কমপক্ষে ৩৬ ঘন্টা সেবা প্রদান করতে হবে কোন সমাজ সেবা বা সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে। সারা বছরই বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত হচ্ছে "ক্রু ক্যাম্প"। প্রতি বছর পালিত হচ্ছে "জাতীয় টিকা দিবস", "মা ও শিশু স্বাস্থ্য পক্ষ", "মাতৃদুগ্ধ দিবস", "পরিবেশ দিবস", "ট্রাফিক সপ্তাহ" ইত্যাদি। এর কিছু কিছু কার্যক্রম বাংলাদেশ স্কাউটসের সরাসরি তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়। এসব কার্যক্রমে নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করে একজন রোভার স্কাউট

অতি সহজেই সেবাকার্যে তার প্রয়োজনীয় মানে উন্নীত হতে পারে। রোভার অঞ্চলের রোভার স্কাউটদের জন্য বিশেষ সুবিধা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের অংশ নিয়ে তারা সহজেই এই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। অন্যান্য জেলা রোভার নিজস্ব উদ্যোগে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করলে রোভার স্কাউটরা সহজেই এই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। রোভার অঞ্চলের তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর পরিচালিত হয় 'হজ্জ ক্যাম্প'। এই ক্যাম্পে সেবা প্রদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে রোভার স্কাউটরা অতি সহজেই প্রয়োজনীয় সময় সেবা প্রদান কার্য সম্পন্ন করতে পারে। প্রতিবছর ক্যাম্প শুরুর পূর্বে প্রতিটি জেলা রোভারে স্বেচ্ছাসেবক রোভার স্কাউট সংখ্যা ও পালনীয় বিষয়াবলি সম্পর্কিত চিঠি প্রেরণ করা হয়।

সমাজ সেবামূলক কাজের একটি নমুনা কর্মসূচি-

ক্র: নং:	কাজের বিবরণ	স্থান	তারিখ	সময়	মন্তব্য
১.	বাঁধ মেরামত	ডিগ্রীর মোড়, নওগাঁ	১২ আগস্ট ২০১০	৩ ঘন্টা	
২.	গাছ হতে পেরেক ওঠানো	বাঙ্গাবাড়িয়া, নওগাঁ	০২ সেপ্টেম্বর ২০১০	৪ঘন্টা	
৩.	হাসপাতালে সেবাদান	আধুনিক সদর হাসপাতাল, নওগাঁ	১৫-২২ অক্টোবর ২০১০ প্রতিদিন	১ ঘন্টা করে মোট ৮ ঘন্টা	
৪.	চক্ষু ক্যাম্পে সেবাদান	কাটখইর হাই স্কুল, সদর, নওগাঁ	১-৭ ডিসেম্বর ২০১০ প্রতিদিন	২ ঘন্টা করে মোট ১৪ ঘন্টা	
৫.	শীতবস্ত্র বিতরণ	আত্রাই রেলওয়ে স্টেশন, নওগাঁ	৩০ ডিসেম্বর ২০১০	৪ ঘন্টা	
৬.	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান	হাট-নওগাঁ, নওগাঁ	২৩ জানুয়ারি ২০১১	৩ ঘন্টা	
			সর্বমোট সময় =	**৩৬ ঘন্টা**	

খ) বিশ্ব সংরক্ষণ বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন।

বিশ্ব সংরক্ষণ ঃ বর্তমানে খুবই আলোচিত একটি বিষয় "পরিবেশ"। আমাদের সামগ্রিক জীবনটাই পরিবেশের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানুষকে তার অস্তিত্ব রক্ষা এবং অগ্রগতির জন্য পরিবেশর উপরই নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ এটি মানুষ তথা জীব জগতের স্বাভাবিক জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুকে প্রভাবিত করে। এতেই বর্তমানে বুঝতে পারি যে, এটি আমাদের জন্য কতটুকু গুরুত্ব বহন করে।

কিন্তু বর্তমানে আমরা এর উপাদানমূহের সঠিক ব্যবহার করছি না। ফলে প্রাসঙ্গিকভাবেই আরেকটি বিষয় আমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে, তা হলো- পরিবেশ দূষণ। অর্থাৎ পরিবেশের অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফল। প্রতি বছর বিশ্বে ৩৫০টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১০ টন পারমাণবিক বর্জ্য উৎপাদন করে। ১৩,০০০ ব্যারেল অশোধিত খনিজ তৈল মহাসাগরের পানিতে মিশ্রিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এসিড বৃষ্টির কারণে ২৫,০০০ টন সালফিউরিফ এসিড ভূ-পৃষ্ঠে নিপতিত হয়। ৩১,৬৮০ হেক্টর বনভূমি উজাড় হয়। লক্ষ লক্ষ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশ্রিত হয়। ভেঙ্গে যাচ্ছে পৃথিবীর রক্ষা আবরণ ওজন স্তর। বৃদ্ধি পাচ্ছে পানির উচ্চতা। দেখা দিচ্ছে- বন্যা। তলিয়ে যাচ্ছে শুকনো ভূমি পানির নীচে। প্রতি বছর ২৫,০০০ শিশু পানি দূষণে মারা যায়। ১৫০টি প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়। ১,৪৪০ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। ২,৬০,০০০ শিশু তাদের প্রথম জন্মদিন দেখতে পায় না। এছাড়া অন্যান্য রোগে মৃত্যু ও পঙ্গুত্বকে বরণ করে নেয় আরো লক্ষ লক্ষ শিশু। আর আমাদের চিৎকার করে বলতে হচ্ছে "ধরিত্রীকে বাঁচাও" "একটি পৃথিবী সকলের যত্নে-সকলের জন্য"।

পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার জন্য বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে সভা, সেমিনার ইত্যাদি। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন। পরিবেশ আমাদের, আমরাই একে রক্ষা করতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে আমরা সচেতন না হলে তা কখনই সম্ভব নয়। সেই সাথে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এর জন্য আমাদের প্রয়োজন পরিবেশ সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান অর্জন। তাহলেই আমরা আমাদের পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করতে পারব। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল-

পরিবেশ সংরক্ষণঃ যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশ যথা- মাটি, পানি, বায়ু, বন্য জীবজগৎ, ময়লা আবর্জনা এবং আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক আচরণ দূষণমুক্ত রাখা সেই প্রক্রিয়াকে পরিবেশ সংরক্ষণ বা বিশ্ব সংরক্ষণ বলে।

পরিবেশ গঠনের উপদানসমূহ ঃ (১) মাটি (২) বায়ু (৩) পানি (৪) বন্য জীবজন্তু (৫) ময়লা আবর্জনা (৬) গাছপালা (৭) মানুষ (৮) পারিবারিক ও সামাজিক আচরণসমূহ।

মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব ঃ মানুষকে তার পরিবেশের উপর নির্ভর করেই জীবন অতিবাহিত করতে হয়। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য কোন কারণে বিঘ্নিত হলে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলাফল মানুষের জীবন যাত্রার উপর প্রভাব ফেলবেই। দেখা দেবে খাদ্যের অভাব। দেখা দেবে বিভিন্ন রোগ বালাই। পরিবর্তন দেখা দেবে মানুষের সাথে মানুষের স্বাভাবিক আচরণের। যা স্বাভাবিক জীবন যাত্রার জন্য হয়ে উঠবে অভিশাপ স্বরূপ।

পরিবেশের ভারসাম্য কিভাবে নষ্ট হয় ঃ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। পরিবেশের নানা উপাদানের মধ্যে নানাবিধ চক্র সংগঠনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশের উপদানসমূহের একটি বিঘ্নিত বা দূষিত করলেই এর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এই দূষণের জন্য যে কারণসমূহ সরাসরি জড়িত তা হচ্ছে- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন উজাড়, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ ইত্যাদি। সর্বোপরি গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া। যার ফলে আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৫°C - ৪.৫°C বৃদ্ধি পাবে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় ঃ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিবেশের উপাদানসমূহ যাতে দূষিত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি পরিবেশের নানাবিধ উপদানের মধ্যে সংগঠিত চক্রসমূহ যাতে বিঘ্নিত না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে। যেমন- গাছপালা অধিক হারে কাটা যাবে না। কাটলে সাথে সাথেই একাধিক নতুন চারা রোপন করতে হবে। ময়লা অবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে বাতাস দূষিত না করে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে তা সারে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, যা রাসায়নিক সারের বিকল্প হবে। এছাড়া মানুষকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে।

মাটি কি ঃ মাটি হচ্ছে কতগুলো প্রাকৃতিক বস্তুর সমষ্টি যা পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে উদ্ভিদের বিভিন্ন রকম সহায়তা দান করে এবং সময়ের পরিবর্তনে উৎস দ্রব্যের উপর সজীব বস্তু ও জলবায়ুর ক্রিয়া অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু কর্মপ্রাপ্ত হয়। মাটিকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায়ঃ ১। কঠিন অংশ ২। ফাঁকা অংশ। মাটির মধ্যে রয়েছে ৪৫% খনিজ দ্রব্য, ৫% জৈব পদার্থ, ২৫% বায়ু, ২৫%পানি। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে বালি, পানি, কর্দম। আর জৈব দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে গাছপালা ও জীব-জন্তুর দেহের অবশিষ্টাংশ।

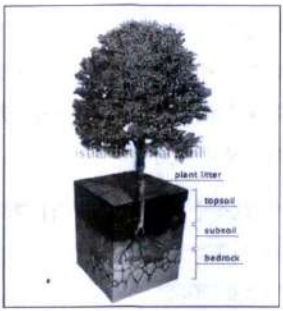

মাটির গুরুত্ব ঃ

১। গাছ জন্মানোর মাধ্যম হিসেবে প্রধান ভূমিকা পালন করে।
২। উদ্ভিদের পুষ্টির গুদামঘর।
৩। পানি সংরক্ষিত রাখে।
৪। রাস্তা-ঘাট, রেলপথ, ব্রীজ, অট্টালিকা প্রভৃতির অবলম্বণ হিসেবে কাজ করে।
৫। উৎপাদনশীল মাটি যে কোন জাতির মেরুদন্ড বা আর্শীবাদ।

উদ্ভিদের পুষ্টির উপাদানের মধ্যে রয়েছে- ১। অক্সিজেন ২। হাইড্রোজেন ৩। কার্বন ৪। নাইট্রোজেন ৫। ফসফরাস ৬। পটাশিয়াম ৭। ক্যালসিয়াম ৮। ম্যাগনেশিয়াম ৯। সালফার ১০। আয়রন ১১। ম্যাঙ্গানিজ ১২। বোরন ১৩। মলিবডেনাম ১৪। কপার ১৫। জিংক ১৬। ক্লোরিন ১৭। কোবাল্ট।
এই উপাদনসমূহের প্রথম তিনটি ছাড়া বাকি সব উপাদান উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগ্রহ করে। যার একটি উপাদানের অভাবেই গাছের পুষ্টিহীনতা দেখা দেবে। এই উপাদানসমূহ মাটির ০-৬ ইঞ্চির মধ্যে থাকে।

মাটি দূষণের কারণ ও প্রতিকার ঃ মাটি দূষণ পরিবেশ উন্নয়নের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। মাটির অপরিকল্পিত ব্যবহারই মাটি দূষণের কারণ। যেমন- একই জমিতে সব সময় একই ফসল ফলানো, ফলন বৃদ্ধির জন্য অধিক হারে রাসায়নিক সার ব্যবহার, কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের জন্য কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার, মাটিতে কল-কারখানার রাসায়নিক বিষাক্ত বর্জ্য পুঁতে রাখা, ময়লা আবর্জনাসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা, যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করা, অধিক হারে গাছপালা কেটে ফেলা, এর ফলে মাটি তার উর্বরতা হ্রাস পেতে শুরু করে চিরস্থায়ী আবাদ অযোগ্য হতে পারে। এ ছাড়া অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও মাটি দূষণের আরেকটি বিশেষ কারণ।

দূষণের হাত থেকে মাটিকে মুক্ত রাখতে হলে একই জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফসল ফলাতে হবে। রাসায়নিক সারের পরিবরর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। মাটিতে কল-কারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য পুঁতে রাখা যাবে না। ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করতে হবে। সেই সাথে জনসংখ্যার অপরিকল্পিত বৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

পানি কি ঃ মানুষের জীবন ধারণের জন্য পানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপদান। শুধু মানুষই নয় সমস্ত জীবের জন্যই কথাটি প্রযোজ্য। তাই বলা হয় "পানির অপর নাম জীবন"। পৃথিবীর ৭১ শতাংশই হচ্ছে পানি। এই পানিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা- ১) পেয় পানি ২) অপেয় পানি।

১) **পেয় পানি ঃ** যে পানি ভাসমান পদার্থ জৈব যৌগ ও রোগ জীবণুমুক্ত স্বচ্ছ তাই পেয় পানি। এতে সামান্য ধাতব লবণ যেমন- সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম প্রভৃতি দ্রবীভূত থাকে। এই পানি স্বাদে তৃপ্তিকর।

২) **অপেয় পানি ঃ** বিষাক্ত, দূষিত, ক্ষতিকর ধাতব লবন ও কলুষ যুক্ত থাকে তাহাই অপেয় পানি।

আবার উৎসভেদে পানিকে ১। মিঠা ও ২। লবণাক্ত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১। **মিঠা পানি ঃ** বৃষ্টিপাত, ভূ-গর্ভস্থ উৎস, ঝরণা, নদী-নালার পানি এই শ্রেণীভূক্ত যা সহজেই পান করা যায়।

২। **লবণাক্ত পানি ঃ** সমুদ্র হতে প্রাপ্ত পানি এই শ্রেণীভূক্ত। এতে শতকরা ৩.৫ ভাগ লবণ মিশানো থাকে বলে স্বাদে লবণাক্ত, যা সহজে পান যোগ্য নয়।

পানি দূষণ ও এর প্রতিকার ঃ পানি দূষণ এখন বিশ্বজোড়া একটি সমস্যা। শিল্প, কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থ, শহরের ময়লা আবর্জনা, জমি থেকে ভেসে আসা রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি পানি দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী। জলাশয় কিংবা নলকূপের কাছে মলত্যাগ করলে পানি দূষিত হয়। এর ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী মারা যায় এবং পানি খাবার অনুপোযোগী হওয়া থেকে

গৃহস্থালী বা কৃষি কাজেও অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। বস্ত্র-কারখানা, পাটকল, রাসায়নিক কারখানা, কাজের কল প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পদার্থ দেশের অনেক নদ-নদীর পানি দূষিত করছে। যেমন- ঢাকার হাজারীবাগ এলাকার চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানা থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার লিটার বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি মারাত্মকভাবে দূষিত করছে। ঘোড়াশাল সার কারখানা থেকে হাইড্রোজেন, এমোনিয়া, পটাশিয়াম-ক্রোমেট, ক্লোরিন শীতলক্ষা নদীর পানি দূষিত করছে। কর্ণফুলী ও রূপসা নদীর পানিও যথাক্রমে কর্ণফুলী কাগজ কল ও খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল থেকে নিষ্কাশিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা ব্যাপক হারে দূষিত হচ্ছে।

সঠিক পদক্ষেপের ফলে পানির এই দূষণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। কঠোর আইনের মাধ্যমে পানিতে রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে। অপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংসে রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তে অন্য কোন নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নলকূপ বা খাবার পানির উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান তৈরি করে নিতে হবে।

বায়ু কি ঃ বায়ু হচ্ছে একটি মিশ্র পদার্থ। এর মধ্যে আছে জীবের জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান। সব জীবের জীবন ধারণের জন্য শ্বসণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা অক্সিজেন এর মাধ্যমে ঘটে। বাতাসে অক্সিজেন এর পরিমাণ ২০.৬০%। উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কার্বন-ডাই-অক্সাইড। বাতাসে এর পরিমাণ ০.০৪%। উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নাইট্রোজেন বায়ুতে যার পরিমাণ ৭৭.১৬% এবং বায়ুই এর সবচেয়ে বড় উৎস। এছাড়া আছে ১০.৪০% জ্বলীয় বাষ্প এবং ০.৮০% নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এর অবস্থান। বাতাসের এই বিস্তৃত অঞ্চল বায়ুমন্ডল নামে পরিচিত যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ভূ-পৃষ্ঠের প্রতি ইঞ্চিতে এর চাপের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১৫ পাউন্ড।

বায়ু দূষণের কারণ ও প্রতিকার ঃ শিল্প কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, মোটর গাড়ী, উড়োজাহাজ, নৌযান প্রভৃতি থেকে নির্গত ধোঁয়া যার মধ্যে থাকে কার্বন মনোক্সাইড, কোরো-ফোরো-কার্বন, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ ও অন্যান্য আবর্জনা জনিত গ্যাস বায়ু দূষণের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এছাড়া কলকারখানার দুর্ঘটনাজনিত কারণে নির্গত অন্যান্য গ্যাসও বায়ু দূষণে গুরুতর ভূমিকা রাখে।

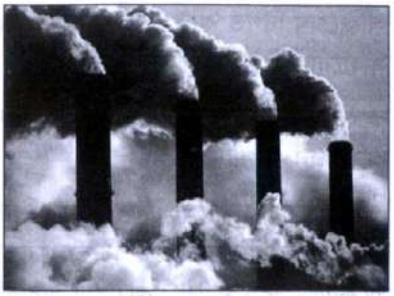

বাংলাদেশের অধিকাংশ বায়ু দূষণের ঘটনা বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ। শহর অঞ্চলের ঘনবসতি, মোটর গাড়ীর কালো ধোঁয়া এবং দেশের শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস এবং যেখানে সেখানে ফেলা আবর্জনা প্রভৃতি থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস বায়ু দূষণের কারণ। এ ছাড়া অধিক হারে বৃক্ষ নিধনও বায়ু দূষণে প্রভাব ফেলছে। কল-কারখানা, নৌযান, উড়োজাহাজ, মোটরগাড়ী ইত্যাদির ধোঁয়া সরাসরি বের হতে না দিয়ে পরিশোধনের মাধ্যমে ত্যাগের ব্যবস্থা করলে বায়ু বিরাট অংশে দূষণ মুক্ত হবে। এছাড়া কল-কারখানায় বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে দুর্ঘটনাক্রমে কোন বিষাক্ত গ্যাস বের না হয়ে পড়ে যেখানে সেখানে আবর্জনা না ফেলে এবং অধিক হারে গাছ কাটা রোধ করতে হবে এবং প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপন করতে হবে।

সালোক-সংশ্লষণ ঃ জীব তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে নানাবিধ জৈবিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। সালোক-সংশ্লেষণ এইরূপ একটি প্রক্রিয়া যার ফলে নির্দিষ্ট জীবদেহে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমগ্র জীবই জীবন ধারণের জন্য তা গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়া ছাড়া প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। সাধারণভাবে বলা যায়- যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিল এর সাহায্য সূর্যালোককে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পানির রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং উপজাত দ্রব্য হিসেবে

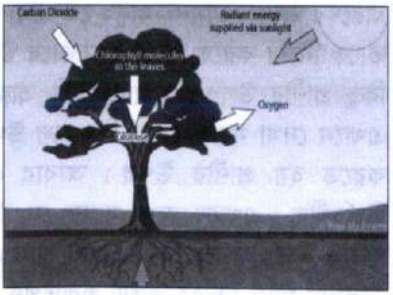

অক্সিজেন নির্গত করে, সেই প্রক্রিয়াকেই সালোক-সংশ্লেষণ বলে। শব্দ সমীকরণের সাহায্যে প্রক্রিয়াটি যেভাবে দেখা যায়-

কার্বন-ডাই-অক্সাইড + পানি আলোকশক্তি + ক্লোরোফিল শর্করা + গ্লুকোজ + অক্সিজেন + পানি।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জীব সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিরূপে খাদ্যে সংরক্ষণ করে এবং ঐ সংরক্ষিত শক্তিই বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে জীব. ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল। কয়েকটি ধারাবাহিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শর্করা উৎপন্ন হয়। যাকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়- ১। আলোক পর্যায় ২। অন্ধকার পর্যায়।

১। আলোক পর্যায় ঃ ক্লোরোফিল আলোক শক্তিকে গ্রহণ করে এর সাহায্যে পানির অণুকে ভেঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরি করে। অক্সিজেন পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়ে বের হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। হাইড্রোজেন পরবর্তী বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। আলো ছাড়া এই পর্যায়ে কোন বিক্রিয়া ঘটে না।

২। অন্ধকার পর্যায় ঃ আলোক পর্যায়ে উৎপন্ন হাইড্রোজেন অনেকগুলো ধারাবাহিক জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর সাথে বিক্রিয়া করে সরল শর্করা উৎপন্ন করে। এই সকল শর্করা পরে উদ্ভিদের প্রয়োজনানুসারে জটিল শর্করায় রূপান্তরিত হয়। এই পর্যায়ের বিক্রিয়া দিনে সম্পাদিত হলে এর জন্য আলোর প্রয়োজন হয় না।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঃ প্রাকৃতিক ভারসাম্য কথাটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, যার গভীর তাৎপর্য রয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি জীবই অপরের উপর নির্ভরশীল তার জীবন ধারণের জন্য। যেমন- মানুষ যে খাদ্য খায় তা তৈরি করার ক্ষমতা মানুষের নেই। তাকে নির্ভর করতে হয় বিশেষভাবে উদ্ভিদ এর উপর এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য কিছু প্রাণীর উপর। আবার প্রাণী তার খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, উদ্ভিদ মূল উৎস। তবে তাকে তার খাদ্যের জন্যও নির্ভর করতে হয় প্রাণীর উপর। আবার প্রাণী তার খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, উদ্ভিদ মূল উৎস। তবে তাকে তার খাদ্যের জন্যও নির্ভর করতে হয়। প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাসে ত্যাগ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড যা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আবার প্রাণীর দেহের অবশিষ্টাংশ মাটিতে মিশে মাটিকে বিভিন্ন জৈবিক উপাদানে সমৃদ্ধ করে, যা উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। উদ্ভিদ শুধু খাদ্যই দেয় না তার খাদ্য তৈরির উপজাত হিসাবে অক্সিজেন তৈরি হয়। যা সমগ্র জীব-জগতের শ্বসন কাজের একমাত্র উপাদান।

এখন দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদ-প্রাণী পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যা একটি চক্রের ন্যায় কাজ করছে এবং চক্রে যে যার কাজ সুষ্ঠুভাবে করে যাচ্ছে। যদি এই সুষ্ঠু পরিবেশে দূষণ দেখা দেয় অর্থাৎ যে কোন একজন যদি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে, তার প্রভাব সবার উপর বর্তায়। ফলে প্রকৃতিতে দেখা দেবে বিপর্যয়। এই হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্যতা।

মানুষ ছাড়া অন্য কোন উপাদানের এই ভারসাম্যতা নষ্ট বা আনয়ন করার একক ক্ষমতা কারো নেই। তাই আমাদের সচেতন হওয়া উচিত যাতে প্রকৃতির প্রতি হুমকি স্বরূপ কোন কাজই আমাদের দ্বারা না ঘটে এবং প্রকৃতির এই ভারসাম্যতা বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এইরূপ বিষয়সমূহের বিপক্ষে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

খাদ্য শৃংখল (Food Chain) ঃ বাস্তুবিদ্যায় (Ecology) উৎপাদক পর্যায়ের জীব থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর খাদকের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। সূর্যের আলোই সব শক্তির উৎস। সবুজ উদ্ভিদ আলোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে সূর্যের আলোক শক্তিকে খাদ্য শক্তিরূপে জমা করে। যখন একটি প্রাণী উদ্ভিদ খায়, শক্তির অনেকাংশই তখন তাপ শক্তিরূপে মুক্ত হয়। শুধুমাত্র কিছু অংশ প্রাণীর দেহ গঠন করে। পুনরায় যখন এই প্রাণীকে অন্য প্রাণী ভক্ষণ করে, অনুরূপভাবে কিছু শক্তি তাপ হিসেবে ব্যয়িত হয়, বাকিটা ভক্ষণ প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির স্থানান্তরকে খাদ্যচক্র বা খাদ্য শৃঙ্খল বলে। খাদ্যচক্র তিন প্রকার।

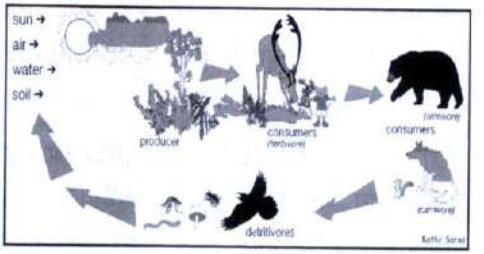

১। **পরভোজী চক্র ঃ** উদ্ভিদ উৎস থেকে ক্রমে ছোট এবং বড় প্রাণীর মধ্যে স্থাপিত খাদ্যচক্র পরভোজী চক্র নামে পরিচিত। যেমন-
উদ্ভিদ→ ছোট মাছ→ বড় মাছ→ মানুষ।

২। **পরজীবি চক্র ঃ** বড় জীব থেকে শুরু করে ক্রমে ছোট জীবের মধ্যে পরজীবি ধরনের জীবে যে খাদ্য চক্র তাকে পরজীবি চক্র বলে। যেমন-
স্তন্যপায়ী ফিস→ প্রোটোজোয়া→ ব্যাকটেরিয়া।

৩। **শবজীবি ঃ** উদ্ভিদ ও প্রাণীর শবদেহের সংগে বিভিন্ন অনুজীব ও প্রাণীর মধ্যে যে খাদ্য চক্র বিদ্যামান, তাকে শবজীবি চক্র বলা হয়। যেমন-
শবদেহ→ ছত্রাক→ কেঁচো।

জীবন চক্র ঃ যে ধারাবাহিক ধাপগুলো অতিক্রম করার মাধ্যমে কোন জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী) ডিম্বাণু দশা থেকে প্রজনন পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় উপনীত হয়ে আপন প্রজাতির ধারাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার মত অবস্থায় পরিণত হয়, সেই ধাপগুলিকে একসাথে জীবন চক্র বলে। যেমন- আমরা রেশম পোকার জীবন চক্রের কথা বলতে পারি। এর জীবন চক্র চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। স্ত্রী মথ ডিম পাড়ে। সেই ডিম ৮/১০ দিনের মধ্যে ফুটে শুঁটকিট বের হয়। সেই শুঁটকিট ২৫/৩০ দিনের মধ্যে মুটকিটে রূপান্তরিত হয় এবং তা ৮/১০ দিন পর পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয়ে সাথে সাথেই ডিম পাড়ে এবং ধাপে ধাপে আবার পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয়। জীবন এখানে চক্রাকারে আবর্তিত হয় বলেই এটি জীবন চক্র নামে পরিচিত।

পরিবেশ ঃ পৃথিবীর সবকিছু ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওজন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমন্ডলে বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, শব্দ, মাটি, পাহাড়, নদ-নদী, সাগর, সম্পূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত, মানুষ নির্মিত কাঠামো, মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক আচরণ এই সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত, তাই হচ্ছে পরিবেশ।

পরিবেশ মানুষকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। যেমন- আহার সরবরাহ করে এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণাদি সরবরাহ করে জীবন যাত্রার মান গুণগতভাবে উন্নত করার জন্য সরবরাহ করে থাকে বিভিন্ন সম্পদ। সে সাথে মানুষের সৃষ্টি সমস্ত আবর্জনাকে গ্রহণ করে এর ব্যাপক অংশের পরিশোধনও নিশ্চিত করে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

১। জড় পরিবেশ
২। জীব পরিবেশ

১। জড় পরিবেশ ঃ যে সমস্ত বস্তু বা উপাদানের প্রাণ নেই। যেমন- মাটি, পানি, বাতাস, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি নিয়ে গঠিত জড় পরিবেশ। এরা হাঁটা চলা বা খাদ্য গ্রহণ করে না এবং বংশ বৃদ্ধি হয় না।

২। জীব পরিবেশ ঃ মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ এদের নিয়ে এই পরিবেশ গঠিত। এদের জীবন আছে। এরা খাদ্য গ্রহণ করে এবং বংশ বৃদ্ধি করে।

সমস্ত পরিবেশকে সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) জড় পদার্থ (সূর্য, পানি ইত্যাদি) (২) উদ্ভিদ (৩) ব্যবহারকারী (মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু) (৪) বিয়োজকসমূহ (ব্যাকটেরিয়া, পোকা-মাকড় ইত্যাদি)।

জৈব ও অজৈব পদার্থ ঃ ১৬৭৫ সালে বিজ্ঞানী লেমেরী প্রাকৃতিক উৎস জাত পদার্থসমূহকে খনিজ, উদ্ভিজ ও প্রাণীজ এই তিনটি ভাগে ভাগ করেন। পরবর্তীতে সন্দেহাতীতভাবে দেখা যায় যে একই পদার্থ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় উৎস হতে প্রস্তুত করা যায়, ফলে এই তত্ত্বকে একটু পরিবর্তন করে প্রাকৃতিক উৎস জাত পদার্থমূহকে জৈব ও অজৈব দু'টি শেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাণী বা উদ্ভিদ অর্থাৎ সজীব উৎস হতে প্রাপ্ত পদার্থসমূহকে জৈব পদার্থ বলে এবং যে সমস্ত পদার্থ সজীব উৎস হতে পাওয়া যায় না এবং খনিজ বা নির্জীব উৎস হতে পাওয়া যায়, সে পদার্থসমূহকে অজৈব পদার্থ বলে।

১৮১৫ সালে বিজ্ঞানী বার্জিলিয়াস মনে করেন যে, জৈব পদার্থসমূহ কেবল এক রহস্যজনক শক্তি- প্রাণশক্তির প্রভাবে জীবদেহে তৈরি হয়। মানুষ এগুলো তৈরি করতে পারে না। শুধু প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ সংগ্রহ করে। ১৮২৮ সালে বার্জিলিয়াসের জার্মান ছাত্র উলার পরীক্ষাগারে এ্যামোনিয়াম সায়ানেট উত্তপ্ত করে আশ্চর্যজনকভাবে জৈব পদার্থ ইউরিয়া প্রাপ্ত হয়ে বার্জিলিয়াসের মতামতের ভিত নড়ে দেন। তবে এ্যামোনিয়াম সায়ানেট প্রস্তুতে ব্যবহৃত অ্যামোনিয়া ও সায়ানিক এসিড প্রাণী জগৎ হতে সংগৃহীত ছিল। পরে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সহযোগীতা ছাড়া ১৮৫৬ সালে বার্থেলো মিথেন প্রস্তুত করে বার্জিলিয়াসের মতামতকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেন। প্রমাণিত হয় যে জৈব পদার্থ জৈব উৎস ছাড়াও অজৈব উৎস থেকেও সংগ্রহ করা সম্ভব। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের জন্য রসায়ন শাস্ত্রের বইপত্রের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণী ও গাছপালাঃ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও গাছপালা সংরনের জন্য যে আইনসমূহ রয়েছে তার প্রয়োগ কঠোরতার অভাব এবং একই সাথে জনসাধারণের সচেতনতার অভাবের ফলে অতীতে আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে গেছে অনেক দুস্প্রাপ্য বন্যপ্রাণী ও গাছপালা। এক সময় বাংলাদেশে তিন প্রজাতির গন্ডার পাওয়া যেত। পাওয়া যেত কালো বাঘ, যা বর্তমানে অবিশ্বাস্য। অবৈধ শিকারীদের লোভ এদেরকে চিরতরে আমাদের দেশ থেকে সমূলে উচ্ছেদ করেছে। বর্তমানেও এর জের চলছে। বর্তমানে যে সব বন্যপ্রাণী বিলুপ্তির পথে রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে ঘড়িয়াল, গুইসাপ, চিত্রা হরিণ, হাতি, চিতা বাঘ, বনরুই, হনুমান, রাজ ধনেশ, ময়ূর ইত্যাদি। এছাড়া শাল, গজার গর্জন, চাপালিশ, শিমূল ইত্যাদি বৃক্ষ বিলুপ্তির পথে রয়েছে।

আমাদের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করতে হবে। স্বীকার করতে হবে পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক আদান প্রদানের সুবিধাসমূহ। যার ফলে মানুষ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ উভয়ভাবেই উপকৃত হচ্ছে। মানুষকে আইন মেনে চলতে এবং আইনের প্রয়োগে সহায়তা করতে উৎসাহিত করতে হবে। যাতে আমরা আমাদের অমূল্য সম্পদগুলোকে ধ্বংশ না করে সংরক্ষণ করতে পারি।

গাছপালা প্রাণীকূল বিলুপ্তি

গাছপালা প্রাণীকূল বিলুপ্তি ও পরিবেশের ভারসাম্যঃ

পরিবেশের ভারসাম্য তার প্রত্যেক উপাদানের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। ফলে গাছপালা বা প্রাণীকুলের বিলুপ্তি অবশ্যই এর ভারসাম্য নষ্ট করতে বিশেষ প্রভাব রাখবে। আমরা ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখতে পারি। যেমন- গাছপালা হচ্ছে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের বিরাট উৎস এবং একই সাথে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশকে পরিশোধিত করে। মাটির ক্ষয়রোধ করে এবং একই সাথে মাটির উর্বরা শক্তিকে বজায় রাখে। এছাড়া এর শাখা প্রশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করে হাজারো রকমের পাখি। তাপমাত্রা ও আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণেও বড় রকমের অবদান রাখে। আবার এদিকে অনেক পশু-পাখী সরাসরি আমাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার বিপদ জনক ছোট ছোট প্রাণী বা উদ্ভিদ ধ্বংসে বহুল অবদান রাখে, ফলে মারাত্মক রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমানো সম্ভব। এ সকল পদ্ধতির সঠিক ব্যবস্থাপনাই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় ফলে এর যেকোন অংশের অব্যবস্থার ফলাফল সবার উপরই খারাপ প্রভাব দেখা দেবে। যার পরিপূরক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্যিই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। তাই আমাদের পরিবেশের ব্যাপারে আরো সচেতন হতে হবে। যা আমাদের জন্যই সুফল বয়ে আনবে।

বনায়ন ঃ গাছপালার উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্বে বহুবার আলোচিত হয়েছে। তাই এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সবাই সচেতন। বনায়নের উদ্দেশ্যে গাছপালা লাগাতে হবে সাধারণত বড় ধরনের গাছের চারাই লাগালো উচিত। যেমন- সেগুন, কড়ই, গজারি ইত্যাদি। প্রথমেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে জমি তৈরি করে নিতে হবে। নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে ২১/২*, ২১/২/*, ২১/২ গর্ত তৈরি করে নিতে হবে। সমপরিমাণ মাটি ও গোবর সার দিয়ে গর্তটি পূর্ণ করে কমপক্ষে ২৫ দিন রাখতে হবে। যাতে গাছে পোকা না ধরে। পোকা ধরলে ঔষধ দিতে হবে এবং নিয়মিত পানি দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে। এতে গাছ মারা যাবে। স্থান নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক গাছ পেতে পারে। প্রয়োজনে আমরা বিশেষজ্ঞদের সহায়তাও গ্রহণ করতে পারি।

কম্পোষ্ট সার ঃ দৈনন্দিন আমাদের গৃহস্থালী কাজের ফলে যে উচ্ছিষ্ট তৈরি হয় তার সাথে গাছের লতা পাতা এবং গোবর ইত্যাদির সংমিশ্রণে তৈরি হয় কম্পোষ্ট সার। এই সারের ব্যবহার আমাদেরকে রাসায়ানিক সারের বিভীষিকা থেকে পুরোপুরি রক্ষা করতে এবং একই সাথে অধিক পরিমাণে ফলনের নিশ্চয়তা দেবে। এটি গাছের প্রায় সকল খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে, মাটির গঠন উন্নত করে, মাটির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, মাটিতে বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করে, মাটির অনুজীবিক কার্যাবলী বৃদ্ধি করে, মাটিকে ঝুর ঝুরে করে, ফলে শিকড় ভালোভাবে মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং মাটির তাপ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কম্পোষ্ট সার তৈরির একটি সাধারণ পদ্ধতি আলোচিত হলো। বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আরো ভালভাবে এটি তৈরি সম্ভব।

প্রথমেই মূল বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে সুবিধাজনক স্থানে ১৫-২০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৭-১০ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি গর্ত খুঁড়তে হবে যার গভীরতা হবে ৩ ফুটের মত এবং সম্পূর্ণ গর্তটাকে দোচালা বা একচালা শেড দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি গর্তে জমতে না পারে। এখন প্রতিদিন খাবার উচ্ছিষ্ট অংশ, গাছের ঝরা লতা পাতা ইত্যাদি গর্তে ফেলতে হবে বর্ণিত নিয়মে-

১ম স্তর (নীচ থেকে) - আর্বজনা (১২" পুরু)
২য় স্তর - গোবর ও মাটি (১২" পুরু)
৩য় স্তর - আর্বজনা (১২" পুরু)
৪র্থ স্তর - গোবর ও মাটি (১২" পুরু)

খেয়াল রাখতে হবে গর্ত ভরে যাবার পর তা যাতে ভূমির উচ্চতা থেকে ১-১১/২ ফুট উঁচু থাকে এবং সর্বোচ্চ স্তরে যাতে গোবর মাটির আবরণ থাকে। এভাবে তিন মাস রেখে দিতে হবে। এরপর গর্তের সমস্ত মাটিকে ভালোভাবে মিশিয়ে আবারও একমাস রেখে দিতে হবে। এরপর তা সার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, যা দামেও হবে সস্তা এবং গুণাগুনেও কোন অংশে কম নয়।

চার্ট তৈরি : পরিবেশ সম্বন্ধে জনগণ সচেতন করার জন্য দুইটি তথ্য বহুল চার্ট তৈরি করতে হবে। চার্টের বিষয় হতে পারে গাড়ির কালো ধোঁয়া বৃক্ষ নিধন, পরিবেশ দূষণ ও জৈব সার ইত্যাদি। দৈনন্দিন প্রয়োজনে আমরা কি ধরণের যানবাহন ব্যবহার করছি। কোন যানবাহন বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সে সাথে কোন যানবাহন বেশি কালো ধোঁয়া নির্গত করে পরিবেশের ক্ষতি করছে, কি ধরণের ক্ষতি হচ্ছে এবং এর প্রতিকার। বৃক্ষ নিধনের

ক্ষেত্রে ভূমির পরিমাণ অনুসারে বনভূমির আয়তন কত হওয়া উচিত, কতটুকু আছে এবং কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর অপব্যবহার কিভাবে রোধ করা যায়। যে সব ক্ষেত্রে গাছপালা ব্যবহৃত হচ্ছে, সে সব ক্ষেত্রে বিকল্প কি হতে পারে। এর অপব্যবহার পরিবেশে কি প্রভাব ফেলে।

পরিবেশ দূষণ ও জৈব সার বিষয়ে বর্তমানে দেশে কি পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা এবং পরিবেশে এর প্রভাব। দৈনন্দিন তৈরি আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখার জন্য পরিবেশ দূষণ এবং সঠিক ব্যবহারে জৈব সার তৈরি করে ব্যবহারকালে কিভাবে তা পরিবেশ ও দেশের অর্থনীতিতে সহায়ক হতে পারে ইত্যাদি বিষয়সমূহে আরো প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ দিয়ে চার্ট তৈরি করা যেতে পারে এবং চার্ট তৈরির জন্য আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে। সময়ের তাল মিলিয়ে সাথে এবং সুযোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে চার্ট তৈরি করা যেতে পারে। পোষ্টার তৈরির মাধ্যমে বা সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে নিবেদন পক্ষে দেয়াল পত্রিকা তৈরির মাধ্যমে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

চার্ট তৈরীর বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন- পাই চার্ট, বার চার্ট, ডোনাট চার্ট, লাইন চার্ট ইত্যাদি। তবে যে কোন পদ্ধতির মাধ্যমেই তথ্য প্রদর্শন করা যেতে পারে।

গ) পূর্বের রোপনকৃত ২টি গাছের যত্ন এবং নতুন ২টি বনজ বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা।

১৪. স্বাস্থ্য পরিচর্যা :

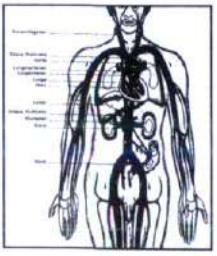

প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জন।

১. স্নায়ুবিক আঘাত কি, কত প্রকার ও কি কি, উদাহরণ, লক্ষণ ও তার প্রাথমিক প্রতিবিধান জানা।

২. মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা। বিভিন্ন প্রকার রক্তবাহী নালীর অবস্থান এবং রক্তপাত বন্ধ করার উপায়সমূহ জানা।

৩. মানবদেহের শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে জানা। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করার কলাকৌশল সমূহ জানা ও প্রদর্শন করতে পারা।

৪. ব্লাড প্রেসার মাপতে জানা।

৫. রোগী বহন করার বিভিন্ন কলাকৌশল প্রদর্শন করতে পারা।

রোগী বহন পদ্ধতি

Human Cratch Method

Pick-A-Back Method

Three Hand Grip Method

Four Hand Grip Method

Two Hand Grip Method

The Four And Aft Method

Firemans Lift And Carry Method

[প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে আরোও জানতে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' বইটি সংগ্রহ করা যেতে পারে।]

৬. মাদকাসক্তি, হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাস এবং এইডস্ রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

মাদকাসক্তি: মাদক দ্রব্যের প্রভাব থেকে নিজ পরিবারকে মুক্ত রাখা।

যে সব দ্রব্য সেবনে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা আনয়ন করে বা কোনো ক্ষেত্রে স্নায়ুর উত্তেজনা সৃষ্টি এবং ব্যাথা উপশম করে তাই হল মাদকদ্রব্য। যখন কোন ব্যক্তি এ সব দ্রব্য সেবন ছাড়া চলতে পারে না অর্থাৎ এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন ঐ ব্যক্তিকে আমরা মাদকাসক্ত ব্যক্তি বলে থাকি। আমাদের দেশে সাধারণত গাঁজা, ভাং, চরস, আফিম, হিরোইন, কোকেন, মদ ইত্যাদি মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এর সঙ্গে আরও রয়েছে তরল অ্যালকোহল শ্রেণির মদ। যেমন- রাম, ভদকা, হুইস্কি ইত্যাদি।

মাদকাসক্ত হওয়ার কারণ ঃ

মানুষ যেসব সু-নির্দিষ্ট কারণে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার করে নেশাগ্রস্ত হয় সেগুলো হল-

১। মাদকদ্রব্যের প্রতি কৌতুহল।
২। বন্ধু বান্ধব ও সঙ্গীদের প্রভাব।
৩। নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আশা।
৪। সহজ আনন্দ লাভের বাসনা।
৫। মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা।
৬। নৈতিক শিক্ষার অভাব।
৭। পারিবারিক কলহ ও অশান্তি।
৮। বেকারত্ব, আর্থিক অনটন ও জীবনের প্রতি হতাশা।
৯। মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা।

মাদকাশক্তির কুফল ঃ

মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মানুষের যে সকল ক্ষতি হয় তা নিম্নে দেয়া হল-

১। মানসিক উত্তেজনা, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও আত্ম হত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
২। শারীরিক ক্ষয়রোধ, রক্ত দূষণ, অনিদ্রা, পেটে ব্যথা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দেই।

৩। কাজে অনীহা, অপরাধ প্রবণতা, সমাজের ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়।
৪। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৭. মাদকাসক্তি প্রতিকারের উপায় ঃ

১। নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রসার করা।
২। বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৩। মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা রোধ করা।
৪। মাদকদ্রব্য আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।
৫। মাদকদ্রব্যের কুফল সবার কাছে তুলে ধরা।
৬। মাদকাসক্তদের সমাজে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।
৭। মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা।

৮। হেপাটাইটিস-বিঃ হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানা।

হেপাটাইটিস-বি ঃ

হেপাটাইটিস-বি এক ধরণের ভাইরাস যা মূলত লিভারকে আক্রমণ করে। এর সংক্রমণের ফলে পৃথিবীর অন্যতম ঘাতকব্যধি লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সার হতে পারে। রক্ত ও রক্তজাত পদার্থ মূলত এই ভাইরাসের বাহক। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সাধারণত কোন লবন বহন করে না, অথচ এদের মাধ্যমে অন্যেরা সংক্রমিত হতে পারে। বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে রক্তরস, লালা, বীর্য ও বুকের দুধ এক দেহ থেকে অন্য দেহে ভাইরাস বিস্তারে সহায়তা করে। সাধারণত আক্রান্ত মায়ের শিশু সন্তান, আক্রান্ত পরিবারের অন্যান্য যেমন- চিকিৎসক, সেবিকা, ল্যাবরেটরিতে কর্মরত ব্যক্তি, দন্ত রোগের চিকিৎসকেরা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

যাদের হেপাটাইটিস বি হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে ঃ

যাদের হেপাটাইটিস-বি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তারা হলেন-

- একের অধিক ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে;
- হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক হয়ে থাকলে;
- শারীরিক মিলনের মাধ্যমে ছড়ায় এমন রোগ থাকলে;
- কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে;
- কারো ব্যবহৃত সূচের মাধ্যমে মাদক নিলে;

- মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একই বাড়িতে বসবাসে করলে;
- মানুষের রক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ করে যারা তাদের;
- কিডনীর অসুখের জন্য যারা হেমোডায়ালাইসিস করেন;
- ভাইরাস প্রবণ এলাকায় বেড়াতে গেলে।

হেপাটাইসিস-বি হলে কি ধরণের জটিলতা দেখা দিতে পারেঃ

হেপাটাইসিস-বি'র ফলে কখনো কখনো মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন-

- যকৃত কলায় ক্ষত বা সিরোসিস;
- যকৃতের ক্যান্সার;
- যকৃত কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া;
- কিডনীর বিভিন্ন সমস্যা;
- রক্তের ধমনীতে প্রদাহ।

হেপাটাইসিস-বি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়ঃ

- সেলুনে চুল, দাড়ি কাটার সময় আলাদা ব্লেড ব্যবহার করা;
- হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা;
- নিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক বজায় রাখা;
- শিরা পথে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকা;
- শরীরে ছিদ্র বা উলকি আকারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা;
- হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস প্রবণ এলাকায় বেড়াতে যাবার আগে টিকা দেয়া;
- যারা চিকিৎসাকর্মী তারা হেপাটাইসিস-বি রোগীর চিকিৎসার সময় বাড়তি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা;
- ইনজেকশন দেবার সময় একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেয়া হয় এমন সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- শিশুদের ক্ষেত্রে ০৩ ডোজ হেপাটাইটিস-বি টিকা দিলে একটি শিশুকে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস থেকে রক্ষা করা যায়। শিশুর বয়স ০৬ সপ্তাহ হলেই হেপাটাইটিস-বি টিকার প্রথম ডোজ দিতে হবে এবং ২৮ দিন বা ০১ মাস পরে ২য় ও ৩য় ডোজ হেপাটাইটিস-বি টিকা দিতে হবে।

এই রোগে করণীয় ঃ

যেহেতু এই রোগের তেমন কোন চিকিৎসা নেই, তাই এই রোগ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হেপাটাইসিস-বি কিভাবে ছড়ায় তা জানা থাকলে

সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভব। খাবারের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। বমি হলে শরীর থেকে দরকারি পানি বেরিয়ে যায় তাই অধিক পরিমানে তরল খাবার রোগীকে দিতে হবে। ক্রণিক হেপাটাইটিস-বি হলে ওষুধ দিয়ে সারানো সম্ভব। গর্ভবতী মায়ের যদি হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস থাকে তবে বাচ্চার জন্মের ২৪ ঘন্টার ভেতর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাচ্চাকে হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন দিতে হবে। এছাড়া চিকিৎসকের পরামর্শ মত খাবার রোগীকে দিতে হবে। বেশী মসলা দেয়া খাবার এই সময় রোগীর জন্য ভাল নয়। যেহেতু হেপাটাইটিস-বি হলে অনেক বমি হয় তাই হালকা খাবার ও অধিক তরল জাতীয় খাবারই রোগীকে দেয়া বাঞ্চনীয়। এছাড়া রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।

মহাঘাতক হেপাটাইসিস-সি ঃ

হেপাটাইসিস-সি এমন একটি ভাইরাস যা বিশ্বব্যাপী মারাত্মক রোগের জীবাণু হিসাবে পরিচিত। এ ভাইরাসের ফলে জন্ডিস থেকে শুরু করে লিভার সিরোসিস এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে। ১৯৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ভাইরাস সনাক্ত করা হয়। হেপাটাইসিস-সি নামক ভাইরাসটি লিভার কোষ ধ্বংষ করে ফেলে লিভার প্রদাহের সৃষ্টি করে ও লিভার কোষ ধ্বংস অব্যাহত রাখে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর মতে, বিশ্বের প্রায় ১৭ কোটি মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের প্রায় ০৩ থেকে ০৬ ভাগ লোক হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসের বাহক। বর্তমানে বাংলাদেশে পেশাদার রক্তদাতাদের মধ্যে শতকরা ১.২ ভাগ লোক এই ভাইরাস বহন করে। এক গবেষনায় দেখা গেছে, দীর্ঘ মেয়াদী লিভার রোগীদের মধ্যে শতকরা ৬.৮ ভাগ স্বল্প স্থায়ী জন্ডিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ১.৭ ভাগ রোগী হেপাটাইসিস-সি ভাইরাসে আক্রান্ত। এইচআইভি বা এইডস রোগের চেয়ে ১০ গুণ বেশি সংক্রামক হলো হেপাটাইসিস-স।

হেপাটাইটিস-সি কিভাবে ছড়ায় ঃ

হেপাটাইটিস-সি পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে ছড়ায়। তাই সেভিং রেজার, ব্লুর, বেন্ডড, টুথব্রাশ, ও ইনজেকশনের সিরিঞ্জ একাধিকবার ব্যবহার করলেও হেপাটাইসিস-সি ভাইরাস ছড়াতে পারে

হেপাটাইসিস সি ভাইরাসের লক্ষণ ঃ

সাধারণত, এ ভাইরাসে আক্রান্তদের ০৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে কোন লক্ষণ থাকে না। অধিকাংশ ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর শরীর ম্যাজম্যাজ করে, অনেকের হাত-

পায়ের পাতা গরম থাকে এবং চোখ জ্বালা করে। আহারে রুচি কম এবং পেটের পীড়ায় ভূগতে থাকে। অনেকে সাদা আমযুক্ত মল ত্যাগ করে। তবে এ রোগের দীর্ঘমেয়াদী ফলশ্রুতি হল লিভার সিরোসিস, লিভার ফেলিউর, রক্ত বমি, পেটে পানি জমা এবং লিভার ক্যান্সার।

হেপাটাইসিস-সি ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার উপায় ঃ

* রক্ত সঞ্চালনের আগে হেপাটাইসিস-সি এর উপস্থিতি নির্ণয় করার জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে রক্তদান কেন্দ্রগুলোতে নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা বাড়ানো;
* সেলুনে সেভ করা পরিহার করা এবং প্রতিজনের জন্য আলাদা আলাদা ব্লেড ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা;
* সর্বক্ষেত্রে ডেসপোজিবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা;
* রক্ত নেয়া বা রক্ত জাতীয় পদার্থ (প্লাটিনেচ বা প্লাজমা) তৈরীর ক্ষেত্রে হেপাটাইসিস-সি ভাইরাস মুক্ত রক্ত ব্যবহার করা;
* অঙ্গ সংস্থাপনের ক্ষেত্রে হেপাটাইসিস-সি ভাইরাস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা;
* ইনজেকশনের যন্ত্রপাতি পরস্পর ব্যবহার না করা;
* ব্যক্তিগত টয়লেট সামগ্রী, যেমন- রেজার, টুথব্রাশ, নেলক্লিপার এবং ত্বক ফোটানো ও রক্ত গ্রহণের যন্ত্রপাতি অন্য কারো ব্যবহার না করা;
* ত্বকে কাটা ছেঁড়া, ক্ষত পরিষ্কার রাখা ও ওয়াটারপ্রুফ ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখা;
* হাতের কাছে ফার্স্টএইড কিট রাখা।

হেপাটাইসিস-সি ভাইরাস আক্রান্তদের করণীয় ঃ

নিয়মিত চিকিৎসা নেবেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করবেন। মনকে প্রফুল্ল রাখবেন ও ভাইরাস নিয়ে চিন্তা করাবেন না। বাইরের সেলুনে সেভ করাবেন না, এমনকি বাসায় আপনার রেজার অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে রাখবেন। কাউকে রক্ত বা কিডনী দেবেন না।

হেপাটাইসিস-সি রোগের চিকিৎসা ঃ

এ ভাইরাসের এখন পর্যন্ত কার্যকরী কোন টিকা বা ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত না হওয়ায় এর প্রতিরোধই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক অবস্থায় এই ভাইরাস সনাক্ত করা গেলে এর চিকিৎসা করা সম্ভব। নব্বই দশকের প্রথম দিকে স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেরন ইনজেকশন দিয়ে শুরু হয় এ রোগের চিকিৎসা। এসময়ে শতকরা ৫-১৫ ভাগ রোগী চিকিৎসায় দীর্ঘমেয়াদী ভাইরাস মুক্ত হত। আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রতিষেধকের মধ্যে

রাইবাভাইরিন ক্যাপসুল ও পেগ ইন্টারফেরন আক্রান্ত রোগীদের ভাল হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এই চিকিৎসার ফলে ৮০ ভাগ ও তদুর্ধ্ব রোগী দীর্ঘমেয়াদে ভাইরাস মুক্ত হতে পারেন। তবে, ইন্টারফেরন চিকিৎসা কার্যকর হওয়া নির্ভর করে চিকিৎসা পদ্ধতি, সি ভাইরাসের জেনোটাইপ, রক্তে সি ভাইরাসের মাত্রা, আক্রান্ত লিভারের ভাইরাস টিস্যু জমার স্তর, মদ্যপান ও অন্যান্য ভাইরাসের উপস্থিতি, লিভারে চর্বি ও আয়রন জমা সহ বিভিন্ন কারণের উপর।

বর্তমানে বাংলাদেশে হেপাটাইসিস-সি রোগ চিকিৎসায় প্রচলিত সব ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। নীরব ঘাতক এ সংক্রামক ব্যাধিটি এইডস, জন্ডিসের চেয়ে ভয়ংকর। তাই এ রোগ থেকে মুক্ত থাকতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎকের পরামর্শ নিতে হবে।

৯। এইডস্-এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানা।

বিশ্বে যে কয়েকটি ঘাতক ব্যাধিতে মানুষ অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হচ্ছে তার মধ্যে এইডস (AIDS) অন্যতম। এইডস (AIDS) রোগের জীবাণু একটি ভাইরাস। এই ভাইরাসের নাম HIV। মানবদেহে HIV- Human Immunodeficiency Virus এর আক্রমণে AIDS- Acquired Immune Deficiency Syndrome রোগ হয়। HIV এক ধরণের ভাইরাস যা নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে মানব দেহে প্রবেশ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়।

HIV সংক্রমণের কারণ ঃ

HIV দ্বারা সমানভাবে সবাই আক্রান্ত হতে পারে। HIV মানুষের শরীরে তিন ধরনের তরল পদার্থের মধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে- বীর্য, রক্ত এবং মাতৃদুগ্ধ। যদি HIV আক্রান্ত ব্যাক্তির শরীরের তরল পদার্থ কোন সুস্থ ব্যক্তির রক্তে প্রবেশ করে তবেই তিনি HIV দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন।

১। HIV আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যৌন মিলন HIV সংক্রমণের প্রধান উপায়।

২। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সূঁচ ও সিরিঞ্জ পরিশোধিত না করে ব্যবহার করলে HIV সংক্রমণ হতে পারে।

৩। HIV বহনকারী গর্ভবতীর গর্ভস্থ সন্তান জন্মের সময় এবং জন্মের পর মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে।

৪। রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমেও HIV সংক্রমণ হতে পারে, যদি দানকৃত রক্ত পরীক্ষিত না হয়।

AIDS রোগের লক্ষণ ঃ

HIV সংক্রমণের ফল রোগীর শরীরে রক্তের কণিকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ধীরে ধীরে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে -

১। AIDS আক্রান্ত রোগীর গায়ে জ্বর আসে। মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে এ জ্বর দীর্ঘ স্থায়ী হয়।

২। লসিকা গ্রন্থি ফুলে যায়, শরীর শুকিয়ে যায় এবং ওজন কমতে থাকে।

৩। ফুসফুস আক্রান্ত হয়, বুকে ব্যাথা হয় ও শুষ্ক কফ জমে।

৪। দুই মাসের অধিক সময় ধরে পাতলা পায়খানা হয়।

৫। রাতে ঘুম হয় না এবং শরীরে ব্যথা ও জ্বালাপোড়া হয়।

এইডস রোগের প্রতিকার ঃ

এইডস রোগের এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা নেই। তাই এইডস প্রতিরোধে আত্মসচেতন ও দৃঢ়চেতা হওয়া আবশ্যক। এইডস প্রতিরোধে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হল-

১। সকলকে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২। রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে রক্তদাতার রক্তে HIV আছে কি না তা অবশ্যই পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৩। নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈধতা, বিশস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৪। বহুগামিতা পরিহার করা এবং সমকামী হওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। অস্বাভাবিক যৌন মিলন পরিহার করা।

৫। এইডস এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ব্যাপক গণ সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৬। শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং অনিরাপদ যৌন মিলন সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করা।

১০. সম-সাময়িক রোগ, স্বাস্থ্য সমস্যা ও তার প্রতিরোধের উপায় জানা (যেমন- ডায়াবেটিকস, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, এভিয়ান ফ্লু, আর্সেনিক, ডেঙ্গু জ্বর ও অ্যানথ্রাক্স)। অপর পৃষ্ঠায় অ্যানথ্রাক্স সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

অ্যানথ্রাক্সঃ বেশ কিছুদিন ধরেই মানুষ পশুবাহিত রোগের শিকার হচ্ছে। বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, এভিয়ান ফ্লুর পর সম্প্রতি অ্যানথ্রাক্স দেখা দিয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। যেসব রোগ অন্য পশু-প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায় সে সব রোগকে

পশুবাহিত রোগ বা Zoonotic রোগ বলে। অ্যানথ্র্যাক্স তেমনি একটি রোগ যা মানুষকে আক্রান্ত করে। এই ব্যাকটেরিয়া ছড়ানোর সুপ্তিকাল বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড দুই থেকে সাত দিন। এটি পশু থেকে মানুষে ছড়ায়, কিন্তু মানুষ থেকে সরাসরি মানুষে ছড়ায় না। আক্রান্ত মানুষের সংস্পর্শে এলে অন্য মানুষ আক্রান্ত হয় না। তিন ধরণের অ্যানথ্রাক্স মানুষের মধ্যে হয়। ত্বকে, পরিপাকতন্ত্রে এবং ফুসফুসে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটি হয় সেটি হচ্ছে ত্বকের অ্যানথ্রাক্স। যার পরিমাণ শতকরা ৯৫ ভাগ। অন্য দুটিতে রোগতাত্ত্বিকভাবে খুব কম মানুষই আক্রান্ত হয়।

অ্যানথ্র্যাক্স কী :

অ্যানথ্র্যাক্স মূলত তৃণভোজী পশুর রোগ। ব্যাবিলাস অ্যানথ্রাক্স নামক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে এটি হয়। এই ব্যাকটেরিয়াটি স্পোর বা শক্ত আবরণী তৈরি করে অনেকদিন পর্যন্ত মাটিতে বেঁচে থাকতে পারে। ঘাস খাওয়ার সময় গবাদিপশু এই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত গবাদি পশুর সংস্পর্শে এলেই কেবল একজন মানুষ আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত গবাদি পশুর শ্লেষ্মা, লালা, রক্ত, মাংস, হাড়, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়।

বাংলাদেশে এর প্রাদুর্ভাব : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেলেও বাংলাদেশে এই রোগটি নিয়ে এতদিন কোন তথ্য উপাত্ত ছিল না বললেই চলে। যেহেতু এটি পশু রোগ তাই প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরই বেশীর ভাগ সময় পশুর টিকা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে এবং এখনো করছে। ২০০৯ সালে জাতীয় রোগ তত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইডিসিআর) পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে মানুষের ত্বকে অ্যানথ্র্যাক্সের ১৪টি রোগ প্রাদুর্ভাবের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। এ বছরও ২০১০ এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল এবং মিডিয়ার কল্যাণে বেশ হইচই হয়েছিল। আইইডিসিআর-এর তথ্য অনুযায়ী ১৮ আগস্ট থেকে ১৬ সেপ্টম্বর ২০১০ পর্যন্ত দেশের ১০টি জেলার ১৭টি উপজেলায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে, যাতে ৫২০ ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন এবং চিকিৎসা নিয়ে সকলেই সুস্থ আছেন। স্থানীয়ভাবে 'অ্যানথ্রাক্স' রোগ 'তড়কা' নামে পরিচিত।

রোগের লক্ষণ ঃ এ রোগটি মূলত ত্বকের। ত্বকে ঘা'র মত হয়। প্রথমে চামড়ায় ফোঁসকা পড়ার মত শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে ঘা হয়ে যায়। গোলাকার ঘায়ের

মাঝখানে কাছে হয় আর চারদিকের চামড়া লালচে হয়ে যার মধ্যে পানি থেকে ফুঁসকুরি জন্মে। রোগীর ইতিহাস নিলে দেখা যাবে, তিন সপ্তাহের মধ্যে কোন না কোনভাবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি গবাদি পশুর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

চিকিৎসায় সম্পূর্ণ ভাল হয় ঃ এই রোগের কারণে জীবন হানি ঘটে না। সময়মত ও সঠিকভাবে চিকিৎসা নিলে রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আটলান্টার রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। সিপ্রোফ্লোক্সাসিন অথবা ডক্সিসাইক্লিন অথবা পেনিসিলিন দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

প্রতিরোধ ঃ অ্যানথ্রাক্সের প্রতিরোধ নির্ভর করে গবাদি পশুর রোগ নিয়ন্ত্রণের ওপর। যেসব এলাকায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে, সেসব এলাকায় সব গবাদি পশুকে অ্যানথ্রাক্সের টিকা দিতে হবে যাতে করে গবাদি পশু আক্রান্ত না হয়। আর আক্রান্ত পশুরও চিকিৎসা করতে হবে। অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত গবাদি পশু অল্প সময়েই মারা যায়। মারা গেলে সেটি চামড়া সহ মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। মৃত গবাদি পশু এমনভাবে পুঁতে ফেলতে হবে, যাতে শেয়াল বা অন্য কোন পশু পাখি মাটি খুঁড়ে এর নাগাল না পায়।

গবাদি পশু পালন ঃ গবাদি পশুতে রোগের লক্ষণ দেখা দিলে নিকটস্থ প্রাণি সম্পদ অফিস বা পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এলাকায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে টিকার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারিভাবে টিকার ব্যবস্থা আছে। খালি হাতে অসুস্থ ও মৃত গবাদি পশু ধরা যাবে না। দুই হাতে গ্লোভস বা মোটা পলিথিনের আবরণ ব্যবহার করতে হবে। এই রোগে আক্রান্ত গবাদি পশু জবাই করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, আক্রান্ত পশু থেকেই এই রোগটি মানুষের মধ্যে ছড়ায়। অসুস্থ গবাদি পশুর মাংস নিরাপদ নয়। অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত গবাদি পশুর তীব্র জ্বর হবে, বমি করবে, নাক দিয়ে রক্ত বেরুবে, ডায়রিয়া হবে, খিঁচুনি হয়ে সাধারণত ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই মারা যায়। অ্যানথ্রাক্স বা তড়কা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। কারণ, গবাদি পশু এই রোগে আক্রান্ত হলে দ্রুত মারা যায় ফলে এটি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে বিক্রি করা বা জবাই করার মতো পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন, পাবনা-সিরাজগঞ্জ অঞ্চল থেকে গবাদিপশু এনে ঢাকার গাবতলীতে বিক্রি হয়। সেখান থেকে যায় কাঁচাবাজারে, কসাইখানায়। সুস্থ গবাদি পশু পরিবহন করে জবাইখানা পর্যন্ত আনতে যে সময় লাগে, অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হলে সে সময়ের মধ্যে পশুর মৃত্যু হওয়ার কথা। আবার যে পশু বিশেষ করে গরু

আক্রান্ত হবে সেটি দুধেল হলেও তার দুধ বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ যে গরু দুধ দেবে সেটি অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত নয় এমনটি ধরেই নেওয়া যায় সুতরাং গরু-ছাগল-ভেড়া-মহিষের মাংস কিংবা দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার গ্রহণে কোনোরূপ ভয়ের কারণ নেই। শুধু খেয়াল রাখতে হবে, আক্রান্ত গরু-ছাগল কেউ যেন জবাই করে মাংস বিক্রি না করে, এমনকি বিনামূল্যেও যদি মাংস পাওয়া যায় তবুও তা গ্রহণে বিরত থাকতে হবে। অ্যানথ্রাক্স শুরু হয় পশু থেকে। কাজেই পশু জবাইয়ের কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের সচেতন থাকতে হবে। লক্ষণ দেখা দিলে আক্রান্ত পশু জবাই করা যাবে না। শেষ কথা, আক্রান্ত পশু মারা গেলে ছয়-সাত ফুট গভীর মাটিতে পুঁতে দিন, অক্সিজেনের অভাবে ব্যাকটেরিয়া মারা যাবে। বন্ধ হবে জীবাণুর উৎস। মৃত পশু পানিতে ভাসাবেন না এবং ফেলে রাখবেন না। আসুন, সুস্থ থাকি সবাই মিলে। লড়াই করে ভাইরাস তাড়িয়েছি এর আগে। এবার ব্যাকটেরিয়া তাড়াব জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য।

অ্যানথ্রাক্সের চিকিৎসা (মানুষের)

ট্যাবলেট সিপ্রোফ্লোক্সাসিন- ৫০০ মিলিগ্রাম, দিনে দুই বার ১২ ঘণ্টা পর পর ১০ দিন। অথবা, ক্যাপসুল ডক্সিসাইক্লিন-১০০ মিলিগ্রাম, দিনে দুই বার ১২ ঘণ্টা পর পর ১০ দিন। অথবা, ট্যাবলেট পেনিসিলিন-ভি-৫০০ মিলিগ্রাম, দিনে চার বার ছয় ঘণ্টা পর পর ১০ দিন। অথবা, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

আত্ম উন্নয়ন :

* ইংরেজিতে নিজের Curriculum Vitae (CV) তৈরি করতে পারা।

জীবন বৃত্তান্ত বা CV হচ্ছে একজন সম্ভাব্য চাকুরীদাতার কাছে একজন চাকুরীপ্রার্থী হিসাবে উপস্থাপন করার প্রাথমিক মাধ্যম। জীবন-বৃত্তান্ত তৈরির আগে যে সকল বাস্তবতার প্রতি নজর রাখতে হবে-

১. একজন চাকুরীদাতা একটি জীবন-বৃত্তান্তের উপর গড়ে ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় দেন না। এজন্য এটি হতে হবে সংক্ষিপ্ত। সুস্পষ্টভাবে তথ্যগুলি উপস্থাপন করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিহার করাই শ্রেয়।

২. একজন অনভিজ্ঞ/সদ্য পাশ করা চাকুরী প্রার্থীর জীবন-বৃত্তান্ত এক থেকে দুই পাতার বেশি হওয়া কোনভাবেই উচিত নয়।

৩. জীবন-বৃত্তান্ত হচ্ছে নিজেকে বিপণন করার মাধ্যম। সুতরাং এটি হতে হবে আকর্ষণীয়। তবে চটকদার কোনকিছু যেমন- রঙ্গিন কাগজ বা রঙ্গিন কালির

ব্যবহার বর্জন করতে হবে। কোন কিছু Highlight করতে চাইলে সেটিকে Bold, Italic বা Underline করা যেতে পারে।

৪. জীবন-বৃত্তান্তের মধ্যে যদি কোন বানান ভুল বা ভাষাগত (Grammatical) ভুল থাকে তবে সম্ভাব্য চাকুরীদাতার আপনার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা হবে। এটি প্রকাশ পাবে যে আপনি কোন কাজই নির্ভুলভাবে করতে সক্ষম নন। সুতরাং একটি CV তৈরির পর সেটি নিজে ভাল করে পড়ুন এবং শুদ্ধ ইংরেজী জানেন এমন ব্যক্তিকে দেখিয়ে নিন।

৫. এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আপনার CV তে সঠিক তথ্য দিবেন। এমন কোন তথ্য সন্নিবেশ করবেন না। যা আপনার Job Interview তে ভুল প্রমাণিত হয়।

জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন অংশ

একটি জীবন-বৃত্তান্তে যে তথ্যগুলো সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপন করতে হয় সেগুলো হলো-

- শিরোনাম (Title)
- সার-সংক্ষেপ (Career Summary) [অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের জন্য বেশি প্রয়োজন]
- ক্যারিয়ার উদ্দেশ্য (Career Objective) [সদ্য পাশ করা চাকুরী প্রার্থীদের জন্য বেশি প্রয়োজন]
- চাকুরির অভিজ্ঞতা (Experience)
- শিক্ষাগত যোগ্যতা (Education Qualification)
- অতিরিক্ত তথ্য (Additional Information)
- ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information)
- রেফারেন্স (Reference)
- নাম ও স্বাক্ষর (Name & Signature)

*** স্বনির্ভর ব্যাজ ও স্কাউট কর্মী ব্যাজ অর্জন।
অথবা অর্জিত না হলে কার্যক্রম চালু রাখা।

স্বনির্ভর ব্যাজ

স্কাউট কর্মী ব্যাজ

স্তর উত্তীর্ণে করণীয় :

- নির্ধারিত ৩০(ত্রিশ) টি ক্রু-মিটিংয়ের অতিরিক্ত এক বা একাধিক বিশেষ ক্রু-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ স্তরের রোভার স্কাউটকে বই পড়ে ও চর্চার মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয় শিখতে হবে। যা বিশেষ ক্রু-মিটিংয়ে জানাতে ও প্রদর্শন করতে হবে।
- যে সকল বিষয় নিয়মিত ক্রু-মিটিংয়ে জানার বা শেখার সুযোগ থাকবে না এবং যে বিষয়গুলি ব্যক্তিগতভাবে শিখতে ও জানতে হবে শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলির ভিত্তিতেই বিশেষ ক্রু-মিটিংয়ের আয়োজন করতে হবে।
- স্তর শেষ হওয়ার পর লিপিবদ্ধকৃত লগ বই-এ অবশ্যই রোভার স্কাউট লিডার ও জেলা রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

নমুনা ক্রু মিটিং

ক্রু মিটিং নং	তারিখ	কাজ	বিশেষ কাজ
বিশেষ ক্রু মিটিং			

এক নজরে 'প্রশিক্ষণ স্তর' প্রোগ্রাম

বিষয় / পর্যায়/স্তর	প্রশিক্ষণ স্তর
বিশেষ জ্ঞান	০১. বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রশাসনিক বিন্যাস, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০২. বাংলাদেশের প্রচলিত আইন জানা। ০৩. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৪. জাতিসংঘ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ক) বাংলাদেশের মৌলিক, অর্থনৈতিক ও সমাজিক সমস্যা নির্ধারণ করা। খ) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ০৫টি সুপারিশ প্রণয়ন। গ) জাতীয় বাজেট কি তা জানা।
ব্যবহারিক কাজ	০৬. রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ করা। খ) লগ বই লিপিবদ্ধ করা। ০৭. ব্যবহারিক দক্ষতা ঃ ক) কমপক্ষে ২টি পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরি করা। খ) সাঁতার জানা। গ) বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম। ০৮. MS Office (Word, Power Point), E-mail সম্পর্কে জানা। ০৯. নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন (কমপক্ষে ১টি) ঃ বৈদ্যুতিক কাজ, কম্পিউটার, আগুন নেভানো, উদ্ধার কর্মি, জনস্বাস্থ্য কর্মি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশুর যত্ন, নার্সিং, সাংবাদিকতা, ক্রাইম প্রিভেনশন, বিমান শিক্ষানবীশ, শীপস নলেজ, রেলওয়ে পরিচালক। ১০. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে নতুন ০৪টি গান জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা।
ধর্মীয় কার্যাবলী	১১. ধর্মীয় কার্যাবলী ঃ ক) নিজ নিজ ধর্মে অবশ্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা। খ) নূন্যতম ০১টি ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনা কাজে অংশগ্রহণ।
আন্দোলনের সেবা	১২. স্কাউটিং ও সেবা কার্যক্রম ঃ ক) কাব স্কাউট/স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ। খ) "স্কাউট ইনস্ট্রাক্টর ব্যাজ" অর্জন।
সমাজ সেবা, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য	১৩. সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন ঃ ক) অন্ততঃ ০৩টি সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত থাকা (পূর্বেরগুলি ব্যতিত)। খ) বিশ্ব সংরক্ষণ বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন। গ) পূর্বের রোপনকৃত ০২টি গাছের যত্ন এবং নতুন ০২টি বনজ বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা। ১৪. স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ ক) প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জন। খ) মাদকাসক্তি, হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাস এবং এইডস্ রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানার্জন। গ) সম সাময়িক রোগ, স্বাস্থ্য সমস্যা ও তার প্রতিরোধ উপায় সম্পর্কে জানা।
আত্মউন্নয়ন	১৬. নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে "স্বনির্ভর ব্যাজ" অর্জন (অন্ততঃ এক বছর)। [কাজ শেষ না হলে চলবে]ঃ কম্পিউটার, পোলট্রি ও মৎস্য চাষ, ভেইরি ফার্ম, সেলাই কাজ (সেলাই, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী), বিউটিশিয়ান, পর্যটন কর্মি, আলোকচিত্র শিল্পী, সেটেলাইট ও টেলিকমিউনিকেশন, সাংবাদিকতা, নার্সারী, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, শিল্পকলা (সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য), চিত্র ও কারুশিল্প, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স ইত্যাদি। ১৭. নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে "স্কাউট কর্মী ব্যাজ" অর্জন [কাজ শেষ না হলে চলবে]ঃ প্রাথমিক প্রতিবিধান, পাইওনিয়ারিং, সিগনালিং, উদ্ধার কর্মি, হেলথ্ মোটিভেটর ইত্যাদি।
সময়সীমা	৯-১২মাস
ক্রু মিটিং (ন্যুনতম)	৩০টি
উত্তীর্ণ	সেবা স্তর

তথ্যসূত্রঃ

১. রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম (নতুন ও পুরাতন সংস্করণ)
২. প্রশিক্ষণ স্তর (পুরাতন সংস্করণ)
৩. সেবা স্তর (পুরাতন সংস্করণ)
৪. দৈনিক প্রথম আলো
৫. www.scout.org
৬. www.bdjobs.com
৭. http://en.wikipedia.org/wiki
৮. দড়ির কাজ (রোভার অঞ্চল কর্তৃক প্রকাশিত)
৯. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বই
১০. বেহেশতী জিওর
১১. বিভিন্ন ওয়েব সাইট

তথ্য সংগ্রহ পাতা

(তোমার সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য এই পৃষ্ঠায় নোট করে রাখতে পার)

তথ্য সংগ্রহ পাতা

(তোমার সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য এই পৃষ্ঠায় নোট করে রাখতে পার)

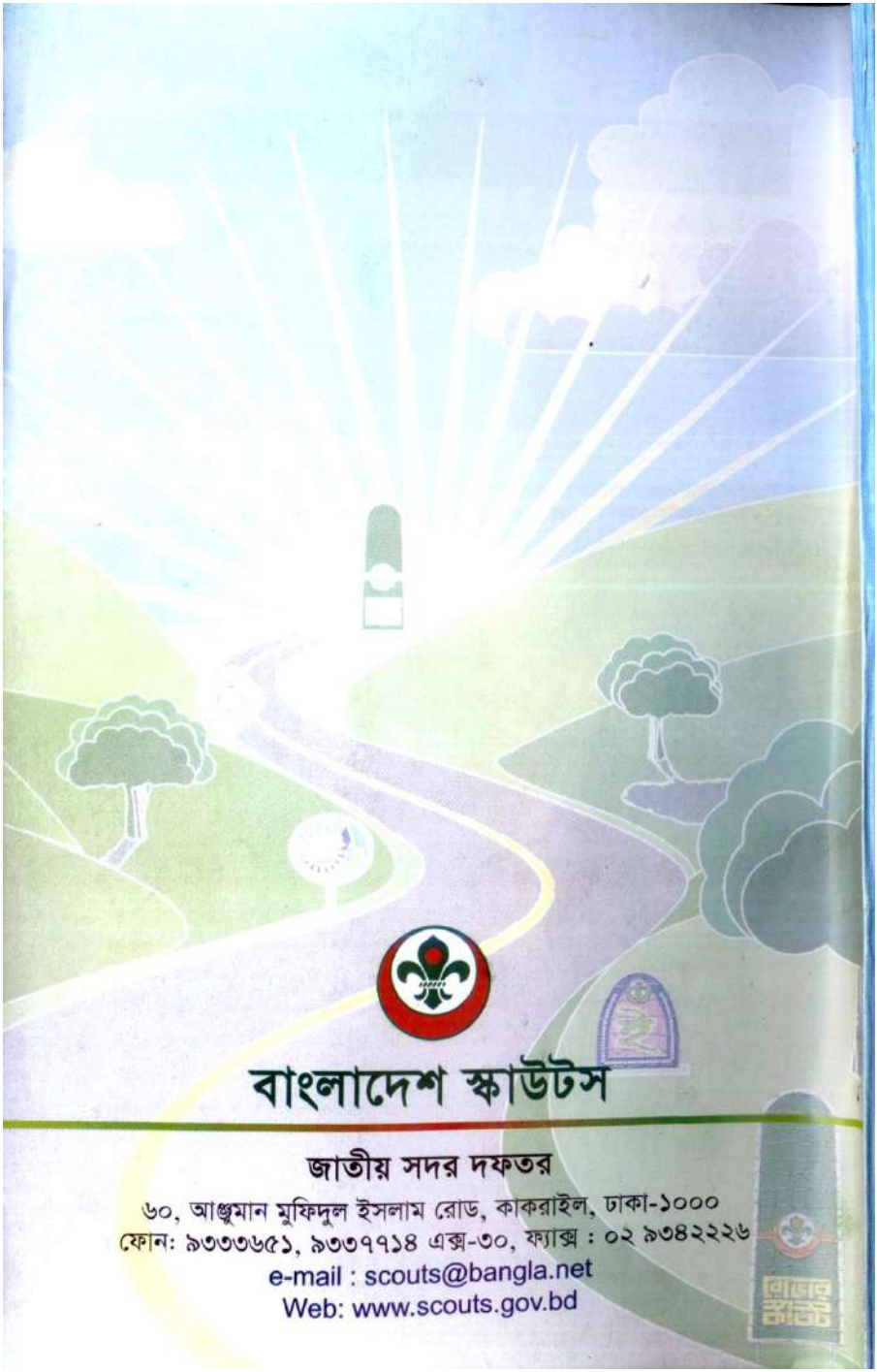

বাংলাদেশ স্কাউটস

জাতীয় সদর দফতর

৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৩৩৬৫১, ৯৩৩৭৭১৪ এক্স-৩০, ফ্যাক্স : ০২ ৯৩৪২২২৬
e-mail : scouts@bangla.net
Web: www.scouts.gov.bd